স্বাস্থ্যের বৃত্তে

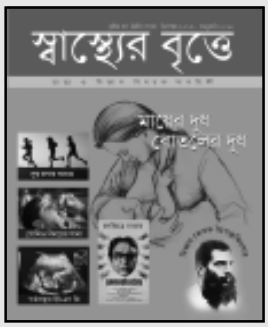

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৩য় বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর২০১৩-
জানুয়ারি ২০১৪

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা
প্রকাশক
ডা. জয়ন্ত কুমার দাস
স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় ৩

শরীর

সুস্থ থাকার ব্যায়াম ❑ ডা. গৌতম মিস্ত্রি ১২
'অস্টিওপোরেসিস' ❑ ডা. রূপনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ১৬
'মাথা ঘোরা': কী, কেন হয় এবং কী করবেন ❑ ডা. সুশীল সিট ১৮
মাথাঘোরার কম জানা কিছু কথা ❑ ডা. সীতেশ দাশগুপ্ত ও ডা. আশীষ কুমার কুণ্ডু ২০
আইবিএস বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম ❑ ডা. পুণ্যব্রত গুণ ২৪
অ্যাসিড খাওয়া রোগীর চিকিৎসা ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী ২৬
নবজাতকের খাদ্য-খাবার ❑ ডা. স্বপন বিশ্বাস ৩৭
গ্যাস, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর: রোগ? না কি স্রেফ 'অভ্যেস'? ❑ ডা. সুজয় বালা ৪১

মন

একটি অন্য লিঙ্গের গল্প ❑ রুমঝুম ভট্টাচার্য ও ডা. সুমিত দাস ২১

শরীর সমাজ

পোলিও ভাইরাস এবং ভ্যাকসিন:কিছু জানা অজানা কথা ❑ ডা. অলোক হালদার ৪
পোলিও: টিকা ও রোগ নির্মূলের ইতিবৃত্ত ❑ ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত ৬
ঋদ্ধিমানের জীবনযাপন ❑ ভাস্বতী রায়চৌধুরী ৪৫
এক নগণ্য জীবাণুর কথকতা ❑ সত্য সাগর ৫৭

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

কামদুনির মায়ের ঘুম নেই ❑ রত্নাবলী রায় ৩১
গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা ❑ ডা. প্রদীপ সাহা ৩৩
কিশোরীদের মানসিক সমস্যার একটি রূপরেখা ❑ রুমঝুম ভট্টাচার্য ৩৫

স্মরণে

বিজ্ঞানলেখক উপেন্দ্রকিশোর ❑ সুব্রত পাল ৪৯

চলচ্চিত্রে ডাক্তার

ডাক্তারবাবু মুর্দাবাদ! ❑ অংশুমান ভৌমিক ৫৩

কুইজ ❑ অভিষেক দাস ৬০

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম ❑ বুকমার্ক ❑ পিপলস্ বুক সোসাইটি ❑ বই-চিত্র ❑ মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট ❑ অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ) ❑ এস. কে বুকস (উল্টোডাঙা)
শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল) ❑ ডা. শুভজিত ভট্টাচার্য (উযুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়) ❑ মেডিকেল কলেজ এমার্জেন্সি গেটের বাইরের স্টল ❑ দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি ❑
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ) ❑ বইকল্প, ঢাকুরিয়া ❑ পুষ্প নিউজ এজেন্সি, মালদহ ফোন : ৯৯৩২৯৬৭৯৯১ ❑ জাতিস্মর ভারতী,
জলপাইগুড়ি : ফোন : ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮ ❑ প্রয়াস মল্লভূম, লোকপুর, বাঁকুড়া : ৯৪৩৪২২৭৪৯৯ ❑ মাধব পেপার স্টল,
বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড : ৯৯৩২৪৫৫২৪৪ ❑ প্রদীপন গাঙ্গুলি, দার্জিলিং : ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২
শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বইয়ের স্টল

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাবার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০৮৮৬৪৪১
ই-মেল : swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র গ্রাহক হোন

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৫০ টাকা

'Swasthyer Britto'-এর নামে চেক বা ড্রাফ্ট
(বাইরের চেকের জন্য ৩০ টাকা যোগ করুন) পাঠান এই ঠিকানায়—
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০ ০৯৭।

অথবা NEFT -র মাধ্যমে পাঠান এই একাউন্টে
Swasthyer Britto,
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code : CNRB0000315

সম্পাদকীয়

পোলিও-মুক্ত বিশ্ব

প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমাদের এই গ্রহ থেকে একটা রোগ চিরতরে বিদায় নিয়েছিল—গুটি-বসন্ত। বিশ্বে তথা ভারতে এ রোগ অজস্র মানুষকে প্রাণে মেরেছে; যাদের মারেনি তাদের অন্ধ করেছে, বা দুষ্টচিহ্ন রেখে গেছে কোটি মানুষের ক্ষতলাঞ্ছিত মুখে। ৪০ বছর আগে পৃথিবী থেকে এ রোগ নির্মূল হয়েছে। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আর সব রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া এ-কাজ সম্ভব হত না।

৪০ বছর বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে বড় স্বল্প সময় নয়; কিন্তু এত দিন চিকিৎসা বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে মানুষ এ রকম কোনও চূড়ান্ত বিজয় আন্তর্জাতিকভাবে অর্জন করতে পারেনি। ৪০ বছর পর আমরা এমনই আরেক বিপুল সম্ভাবনার দোরগোড়ায়। সে সম্ভাবনা হল পোলিও রোগ নির্মূল করার, পোলিও-মুক্ত পৃথিবী গড়ার। খুব অঘটন কিছু না ঘটলে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত আন্তর্জাতিক মানচিত্রে 'পোলিও-মুক্ত দেশ' হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। কী করে এই প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করা গেল? ভারত পোলিও-মুক্ত ঘোষিত হবার পরেও পৃথিবীর তিনটি দেশের পোলিও মুক্তি ঘটবে না— কবে বিশ্ব পোলিওকে শেষ বিদায় জানাতে পারবে? পোলিও-মুক্ত হওয়া মানে কি বাচ্চাকে আর পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে না? পোলিও টিকা সম্পূর্ণ নিরাপদ তো? নাকি সেই টিকাকে বদলানোর দরকার আছে?

জোনাস এডওয়ার্ড সক পোলিও টিকা ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করেছিলেন, অ্যালবার্ট ব্রুস স্যাবিন মুখে খাবার পোলিও টিকা আবিষ্কার করেছিলেন — এঁরা কেউই টিকার পেটেন্ট নেননি, নিজে বিলিওনেয়ার হওয়ার বদলে চেয়েছিলেন বিশ্বে যেন একটি শিশুকেও পোলিওতে ভুগতে না হয়। পোলিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত যে কিশোরী ক্রাচ নিয়ে রাস্তায় হেঁটে চলে, যে শিশু মায়ের কোল থেকে নেমে চলতে পারে না, যে সব জীবন বয়ে চলে বাঁচবার গাঢ় বেদনা, তাদের কথা মনে রেখে 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-র এই সংখ্যায় একবার ফিরে দেখব, স্যাবিন ও সক-এর স্বপ্নের পোলিও-মুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলবার, পোলিওকে কোনওদিন ফিরে আসতে না দেবার ঠিক উপায়টা কী, আর দেখব কতটা পথ আরও পেরোনো বাকি রয়ে গেছে।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনও পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

পোলিও ভাইরাস এবং ভ্যাকসিন কিছু জানা কিছু অজানা কথা

আমাদের দেশে পোলিও রোগ নির্মূল হতে চলেছে। মুখে খাওয়ার যে পোলিও টিকা ব্যবহার করে আমরা এই সাফল্য অর্জনের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছলাম, সেই টিকাই আবার অল্প কিছু সংখ্যক শিশুর দেহে পোলিও পক্ষাঘাত ঘটাচ্ছে, এবং বন্য পোলিও ভাইরাসের সঙ্গে জিন দেওয়া-নেওয়া করে নতুন পোলিও ভাইরাসের জন্ম দিচ্ছে। অতঃ কিম? আলোচনা করছেন ***ডা. অলোক হালদার।***

ভারতবাসীর গর্বের মুহূর্ত : ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ২০১২, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী গুলাম নবি আজাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং 'রোটারি ইন্টারন্যাশনাল' আয়োজিত 'পোলিও সম্মেলন ২০১২' (Polio Summit 2012) অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর উপস্থিতিতে সরকারি ভাবে ঘোষণা করলেন, যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) পোলিও অধ্যুষিত দেশগুলোর (Polio Endemic Country) তালিকা থেকে ভারতের নাম মুছে দিয়েছে। এখন থেকে আমরা পরপর দু'বছর এই পোলিও-মুক্ত অবস্থান ধরে রাখতে পারলে তবেই পাকাপাকি ভাবে পোলিওমুক্ত দেশ হিসাবে সম্মানিত হব।

পৃথিবীর অন্য দেশগুলির পোলিওমুক্ত হওয়ার চিত্র : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীর তিনটে অঞ্চলকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে দিয়েছে।

- আমেরিকা - ১৯৯৪ সালে
- ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক অঞ্চল-২০০০ সালে
- ইউরোপ মহাদেশ - ২০০২ সালে।

সারা পৃথিবীর পোলিও-পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা

	সাল	দেশের সংখ্যা	পক্ষাঘাতগ্রস্ত পোলিও রোগীর সংখ্যা
১।	১৯৮৮ সালের আগে (অর্থাৎ GPEI বা WHO কর্তৃক Global Polio Eradication Initiative-এর আগে)	১২৫	৩,৫০,০০০ (সারা পৃথিবী)
২।	২০১১ সাল	১৬	৬৫০ [পাকিস্তান-১৯৮, আফগানিস্তান-৮০, চিন-২১, ভারত-১ (হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) এবং অন্যান্য]
৩।	২০১২	৪	৮৪ (ভারতে একটিও নয়)

পৃথিবী ও ভারতে পোলিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা

	সাল	পোলিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা	
		পৃথিবী	ভারত
১।	১৯৯৮	৬৩৪৯	১৯৩৪
২।	২০০৫	১৯৫১	৬৬
৩।	২০০৭	১৩৮৭	৮৭০
৪।	২০০৮	১৭৩২	৫৫৭
৫।	২০০৯	১৭৮৩	৭৪১
৬।	২০১০	১৪১৩	৪০
৭।	২০১১	৭১৬	১
৮।	২০১২	২৯১	০

বিশ্ব রেকর্ড?

সুদীর্ঘ ১৩ বছর ধরে লাগাতার পালস পোলিও টিকাকরণ সারা দেশ জুড়ে করে তবে আমরা পোলিও রোগ থেকে অব্যাহতি পেলাম। সেই হিসাবে এটা একটা বিশ্বরেকর্ড।

কেন এত দীর্ঘ সময় লাগল?

১। দেশের সব বাচ্চাকে পোলিও টিকা খাওয়ানো যায়নি বলে? (টিকাকরণ প্রকল্পের ব্যর্থতা)।

২। মুখে খাওয়ার পোলিও টিকা (OPV) সঠিক কাজ করেনি বলে? (টিকার ব্যর্থতা)

এ প্রশ্নের উত্তর যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেল, ২০০৯ সালের পোলিও আক্রান্ত শিশুরা (উত্তরপ্রদেশে ৫৫% এবং বিহারে ৫৭% ক্ষেত্রে) তাদের জীবনে অন্তত দশ বার মুখে খাবার পোলিও টিকা খেয়েছে।

তবে কেন তাদের পোলিও পক্ষাঘাত হল?

পরীক্ষা করে জানা গেল টিকাকরণের জন্য ব্যবহৃত মুখে খাওয়ার পোলিও টিকা (t.OPV বা Trivalent OPV) প্রতি ২ ফোঁটা ডোজ পোলিও সৃষ্টিকারী 'বন্য' পোলিও ভাইরাস (Wild Polio Virus)-এর সব ক'টা ধরনের বিরুদ্ধে সমান কার্যকর নয়। t.OPV -র প্রতি ডোজ, অর্থাৎ দু' ফোঁটা 'বন্য' পোলিও ভাইরাস টাইপ ১ (WPV-1) -র বিরুদ্ধে বিহারে মাত্র ১৮ শতাংশ কার্যকর, উত্তরপ্রদেশে ৯ শতাংশ কার্যকর। আবার এই টিকা WPV-3 র বিরুদ্ধে বিহারে ২২ শতাংশ আর উত্তরপ্রদেশে ৯ শতাংশ কার্যকর। অর্থাৎ এই টিকা যদি কোনও বাচ্চাকে লাগাতার ১৫ মাস ধরে প্রতি মাসে খাওয়ানো হয়, তবুও উত্তরপ্রদেশে WPV-1-এর বিরুদ্ধে মাত্র ৮৫-৯০ শতাংশ কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে। বা অন্য কথায়, ১০-১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে, কার্যকর প্রতিরোধ ১৫টি ডোজের পরেও গড়ে উঠবে না।

মুখে খাবার পোলিও টিকা (OPV) কী এবং কীভাবে কাজ করে?

'OPV' (Oral Polio Vaccine) একটি জীবিত ভাইরাস টিকা। মূলত তিন প্রকার রোগ সৃষ্টিকারী বন্য (wild) পোলিও ভাইরাস (টাইপ-১, ২, ৩) থেকে রোগ সৃষ্টিকারী অংশটা বাদ দিলে যে জীবন্ত কিন্তু নির্বিষ (অকেজো) অংশটা থেকে যায় তার থেকে তৈরি করা হয় এই টিকা। এটার রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু শরীরে প্রবেশ করলে 'অ্যান্টিজেন' হিসাবে কাজ করে এবং শিশুর দেহে প্রতিরক্ষা (অ্যান্টিবডি) তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে বন্য (wild) পোলিও ভাইরাস-এর সংক্রমণ প্রতিহত করে।

মুখে খাওয়ার পোলিও টিকা শিশুকে খাওয়ানোর পরে মূলত তিন ভাবে তা রোগ প্রতিহত করে—

১। খাদ্যনালীর মধ্যে অবস্থিত লসিকাগ্রন্থির সঙ্গে OPV আটকে গিয়ে সেখানেই আইজি-এ গোত্রের 'অ্যান্টিবডি' তৈরি করে যা পরবর্তীকালে বন্য পোলিও ভাইরাস (WPV)-কে খাদ্যনালীতে আটকে থাকতে বাধা দেয়।

২। OPV-তে থাকা জীবন্ত কিন্তু কমজোরি ভাইরাস অন্ত্রে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে এবং সেই বহু সংখ্যক টিকা ভাইরাসের বংশধরেরা মলের সঙ্গে বেরিয়ে এসে নিকটবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এ ভাবে যাদের পোলিও টিকা (OPV) কখনও খাওয়ানো হয়নি, তাদেরও পরোক্ষ ভাবে টিকাকরণ হয়ে যায়। এই ভাবে নিকটবর্তী এলাকা থেকে বন্য পোলিও ভাইরাস (WPV) ধীরে ধীরে টিকা ভাইরাসের উত্তরসূরি ভাইরাস দিয়ে বিতাড়িত হয়।

৩। রক্তের মধ্যে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি (মূলত আইজি-এম ও আইজি-জি) বন্য পোলিও ভাইরাসকে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের দিকে ছড়িয়ে যেতে বাধা দেয়।

এই পোলিও রোগমুক্তি কি যথার্থ মুক্তি?

পৃথিবীর অন্যান্য পোলিও-মুক্ত দেশে পোলিও রোগের ভয়ঙ্কর প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে।

২০০২-২০১১ সালের মধ্যে পোলিও মুক্ত বলে ঘোষিত ১৯টি দেশে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পুনরায় বন্য পোলিও ভাইরাস (WPV) চলে আসায় পুনঃসংক্রমণ (reinfection) হয়েছে। যেমন ঃ—

সাল	দেশ	রোগীর সংখ্যা
২০০০	অ্যাঙ্গোলা	৫৫
২০০৪	সুদান	১২৭
২০০৫	ইয়েমেন	৪৭৮
	ইন্দোনেশিয়া	৩০৩
২০০৯	চাদ	৬৪
২০১০	তাজিকিস্তান	৪৫৭
	কঙ্গো	৪৪১
২০১১	চাদ (আবারও)	১৩৪
	কঙ্গো (আবারও)	৯৪

পোলিও মুক্ত ঘোষিত হওয়ার ১০ বছর পরে তাজিকিস্তানে ২০১০ সালে বন্য পোলিও ভাইরাস (WPV-1) পুনঃসংক্রমণে ৪৫৭ জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন। বিস্ময়কর হল এঁদের ৮ শতাংশ অর্থাৎ ৩৭ জন রোগীর বয়স ১৪ বছরের বেশি। ভাইরাসটি WPV-1, এবং তা ভারত থেকে সংক্রামিত হয়েছে বলে জানা গেছে। একই ভাবে দীর্ঘ ১০ বছর পোলিও মুক্তির পরে নামিবিয়াতে ২০০৬ সালে ভারত থেকে (অ্যাঙ্গোলা ঘুরে) WPV1 এর পুনঃসংক্রমণের ফলে যে ১৯ জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের সবার বয়স ১৪ বছরের বেশি। অর্থাৎ পুনঃসংক্রমণের ফলে পূর্ণবয়স্কদেরও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সাফল্যের পাশাপাশি ভবিষ্যতের হুঁশিয়ারি

হুঁশিয়ারি তিনটে —

১। টিকাজনিত পোলিও পক্ষাঘাত বা VAPP (Vaccine Associated Paralytic Polio) : পোলিও টিকায় কমজোরি ভাইরাস, অন্ত্রের মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে অকেজো করে রাখা 'পক্ষাঘাত-করা-ধর্ম' ফিরে পায় এবং সক্রিয় হয়ে পক্ষাঘাত (Neuroparalysis) করে। মুখে খাবার t.OPV-এর মধ্যে থাকা টাইপ-২ ভাইরাস থেকেই বেশি VAPP হয়।

ভারতে বন্য পোলিও ভাইরাস (WPV) সংক্রামিত পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা ২০০৫ সালে-৬৬, ২০১০ সালে ৪২ এবং ২০১১ সালে মাত্র ১। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ওই সময়ের মধ্যে VAPP রোগীর সংখ্যা ৬০ থেকে ৮০। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল, VAPP রোগীকে 'নন-পোলিও' (Non-Polio) রোগী বলে ভারতে পরিসংখ্যান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং আক্রান্ত রোগী এবং পরিবার কোনও রকম সরকারি সাহায্য পায়নি।

প্রসঙ্গত : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মোট ৪জন VAPP রোগী শনাক্ত হওয়ায় (প্রতি ৭,৫০,০০০ মুখে খাবার পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়া শিশুর মধ্যে একটি VAPP) ওদেশে মুখে খাবার পোলিও ভ্যাকসিনের বদলে ইঞ্জেকশন দেওয়ার মতো পোলিও ভ্যাকসিন (IPV) চালু হয়েছে ১৯৬১ সাল থেকে।

২। ভ্যাকসিন সৃষ্ট পোলিও ভাইরাস (VDPV - Vaccine Derived Polio Virus) : এই নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হয় মুখে খাওয়ার পোলিও ভ্যাকসিন (OPV) ভাইরাস এবং বন্য (wild) পোলিও ভাইরাসের মানুষের অন্ত্রে সহাবস্থানের ফলে জিনগত পরিবর্তনের জন্য। এই উদ্ভূত নতুন (mutant) ভাইরাস মূল OPV ভাইরাস থেকে কিছুটা পরিবর্তিত রূপে থাকে, এবং এদের পক্ষাঘাত ঘটানোর ও নিকটবর্তী এলাকায় সংক্রমণের ক্ষমতা থাকে।

২০০৫ সালে ৫ জন এবং ২০১১ সালে ১৩ই জুলাই পর্যন্ত ৫ জন 'VDPV' রোগী ভারতে পাওয়া গেছে। সব ক'টাই টাইপ-২ VDPV বলে জানা গেছে।

৩। বায়োটেররিজম-এর অস্ত্র হিসাবে পোলিও ভাইরাসের ব্যবহারের সম্ভাবনা অলীক নয়।

অথ IPV কথা ঃ—

IPV (Inactivated Polio Vaccine) : এটা একটা 'Killed Vaccine' অর্থাৎ মৃত ভাইরাস টিকা, সুতরাং IPV দ্বারা পরবর্তীকালে মুখে খাওয়ার জীবন্ত ভাইরাস 'OPV' র মতো VAPP বা VDPV ঘটানোর সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এটা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা এবং উন্নত দেশগুলোর পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে প্রাথমিকভাবে তিনটে ডোজ (১৪ সপ্তাহের মধ্যে) দিলে ৩ রকম (Type-1, 2, 3) বন্য পোলিও ভাইরাস সংক্রমণ থেকে ৯৮-১০০ শতাংশ নিরাপত্তা জীবনভর দেওয়া যায়।

পোলিও রোগ থেকে তবে সম্পূর্ণ মুক্তির পথ কী?

সারা পৃথিবী পোলিওমুক্ত ঘোষিত হওয়ার পরে ধাপে ধাপে 'OPV' বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ অতীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিয়েছিল কারণ বন্য পোলিও ভাইরাস থেকে মুক্ত হলেও 'OPV' ব্যবহার করলে তা থেকে উদ্ভূত VAPP বা VDPV সংক্রান্ত নতুন ভাবে পোলিও সংক্রমণের সম্ভাবনা অন্তত কিছু বছরের জন্য থেকেই যায়।

উন্নত দেশগুলো পোলিওমুক্ত হওয়ার পরে 'IPV' ব্যবহার করে আসছে কারণ এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

উন্নয়নশীল বা গরিব দেশগুলোর পক্ষে IPV ব্যয়বহুল। কিন্তু অন্তত ৩টে প্রাথমিক ডোজ জন্মের ১৪ সপ্তাহের মধ্যে দিলে পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রায় ১০০ শতাংশ কার্যকরী এবং নিরাপদ প্রতিরোধ যখন গড়ে তোলা যায়, তখন সারা পৃথিবীকে দরকার হলে অনেক কৃচ্ছসাধন করেও OPV বন্ধ করে IPV চালু করার পথে হাঁটতে হবে।

আশার কথা এই যে বিদেশি কোম্পানির ইনজেকশন দেওয়ার পোলিও টিকার পাশাপাশি একটি দেশি ওষুধ প্রস্তুতকারকের ইঞ্জেকশন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে যার দাম তুলনামূলক ভাবে কিছুটা কম। ভবিষ্যতে টিকা প্রস্তুতকারকরা যদি তিনটি প্রাইমারি ডিপিটি ভ্যাকসিনের সঙ্গে একত্রে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পোলিও টিকা বাজারে নিয়ে আসে (Quadrivalent বা pentavalant vaccine) তা হলে ইঞ্জেকশন পোলিও টিকার দাম নিশ্চয়ই কিছুটা সস্তা হতে পারে, টিকা দেবার খরচও কমবে।

যত তাড়াতাড়ি হাঁটা শুরু করা যায় ততই মঙ্গল।

লেখক পরিচিতি : ডা. অলোক হালদার, এম বি বি এস, ডি সি এইচ, প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিযুক্ত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ।

ADVERTISEMENT

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

পোলিও: টিকা ও রোগ নির্মূলের ইতিবৃত্ত

বিশ্ব থেকে গুটিবসন্তকে নির্মূল করা হয়েছে, ৪০ বছর হতে চলল। এত দিনের মধ্যে আর কোনও বড় রোগের বিরুদ্ধে সে রকম সাফল্য আসেনি। কিন্তু এইবার পোলিও রোগ নির্মূল হবার মুখে। এ কাজ বড় সহজ নয়—লিখছেন **ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত।**

পোলিও, বা পুরো নামটা বলতে গেলে পোলিওমাইলাইটিস, যে রোগে বহু মানুষের হাত-পা সব প্যারালিসিস হয়ে যায়, ভারত থেকে সেই রোগ এখন প্রায় বিতাড়িত। গোড়ায় অবশ্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল, ১৯৯৭ সালে ভারত পোলিও-মুক্ত হবে, সুতরাং ১৬ বছর দেরি হয়েই গেছে। ভারত যদি সত্যিই পোলিও-মুক্ত হতে পারে তো আমাদের দুই প্রতিবেশি, পাকিস্তান আর আফগানিস্তান ছাড়া এশিয়ায় পোলিও থাকবে না, পৃথিবীতেও পোলিও থাকবে আর একটিমাত্র দেশে। সেটা হল আফ্রিকার নাইজেরিয়া।

কিন্তু কেন এত দেরি? বহু কারণ আছে। সাধারণ সচেতনতার অভাব, টিকা ঠিকঠাক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় ব্যর্থতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং স্থানীয় পরিকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধার সমস্যা।

তবে এখন দেরি হবার কারণগুলো নিয়ে কাটাছেঁড়া করা আর কার কতটা দোষ, সেই হিসাবে না গিয়ে, যেটুকু সাফল্য অর্জন করা গেছে সেটাকে সমানভাবে বজায় রেখে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে পথ চলা দরকার।

ভাইরাস : বন্য ভাইরাস খাদ্য বা পানীয় জলের মাধ্যমে অন্ত্রে প্রবেশ করে শ্লেষ্মাঝিল্লিতে আটকে যায়, আর সেখানে বংশবৃদ্ধি করে। যথেষ্ট বংশবৃদ্ধি করার পরে বেশিরভাগ ভাইরাসই মলের সাথে বেরিয়ে গিয়ে পরিবেশে মিশে যায়। কিন্তু কিছু বন্য ভাইরাস রক্তেও প্রবেশ করে শিরদাঁড়ায় পেশি চালনা করার নার্ভকে অকেজো করে দেয়। যদিও সাধারণত পা অথবা হাতের পেশিই আক্রান্ত হয় (Spinal Poliomyelitis) কিন্তু কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এই ভাইরাস মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকে অকেজো করে দিয়ে এনকেফেলাইটিস জাতীয় রোগের সৃষ্টি করতে পারে (Bulbar Poliomyelitis)।

পোলিও ভাইরাস, সে বন্যই হোক আর টিকার ভাইরাস, তাদের তিনটে ধরন আছে—আমরা বলি তিনটে সেরোটাইপ। সেরোটাইপ জিনিসটা কী সেটা এখানে না জানলেও চলবে। তিনটে সেরোটাইপকে নাম দেওয়া হয়েছে ১, ২, ৩। তিনটে সেরোটাইপের প্রত্যেকটার বন্য ধরন পোলিও-পক্ষাঘাত ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু তাদের প্রকৃতি ও আক্রমণক্ষমতার ফারাক আছে। তিনটে ধরনের কোনওটাই দেহের বাইরে ৭২ ঘণ্টার বেশি বাঁচে না। অবশ্য শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর নীচের তাপমাত্রায়, যেখানে জল জমে বরফ হয়, সেখানে রাখলে অনেক দিন বাঁচে— কিন্তু প্রকৃতিতে বেঁচে থাকতে গেলে তাদের একজন মানুষের দেহ ছাড়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আরেক জন মানুষকে ধরতেই হবে। সেই দ্বিতীয় মানুষটির যদি টিকা দ্বারা বা স্বাভাবিকভাবে পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করা থাকে তো ভাইরাসটি মারা পড়বে। পোলিও ভাইরাস মানুষ ছাড়া অন্য জীবের শরীরে বাঁচতে পারে না, আর পরিবেশে হাওয়া-জল-মাটিতে বেশিক্ষণ টিকতে পারে না---এই দুটো বৈশিষ্ট্যের পোলিও রোগটাকে গুটিবসন্তের মতোই চিরকালের জন্য নির্মূলীকরণ (eradication) করতে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

তিনটে সেরোটাইপের মধ্যে সেরোটাইপ ১ হল সবচেয়ে আক্রমণ-ক্ষমতাসম্পন্ন ভাইরাস—২০০ মানুষকে সংক্রামিত করলে এক জনের পোলিও রোগ হবে। এই টাইপটা সহজে বহু দূরে চলে যেতে পারে, অবশ্য তা যায় মনুষ্য-বাহিত হয়েই। এখন নাইজেরিয়া, পাকিস্তান আর আফগানিস্তানে এই টাইপটা স্থানীয় মারী ঘটাচ্ছে। সোমালিয়ার মতো কয়েকটা দেশ পোলিও-মুক্ত হয়েও আবার এই সেরোটাইপ ১ এর কবলে পড়েছে। সোমালিয়া পোলিও-মুক্ত ঘোষণা করার পরে আবার ২০১৩ সালে এ পর্যন্ত ১৭৫টা পোলিও হয়েছে। ইথিওপিয়া ও কেনিয়ার অভিজ্ঞতাও একই রকম—পোলিও-মুক্ত ঘোষণার পরে ২০১৩ সালে ইথিওপিয়ায় ৪টে ও কেনিয়ার ১৪টা পোলিও হয়েছে। নাইজেরিয়া থেকে আসা সেরোটাইপ ১ ভাইরাস ইজরায়েলের পয়ঃপ্রণালীতে পাওয়া গেছে, যদিও টিকাকরণের হার খুব বেশি থাকার দরুন ইজরায়েলে কারও পোলিও-পক্ষাঘাত হয়নি। এমনকী চিনে ২০১১ সালে সেরোটাইপ ১ ভাইরাসঘটিত পোলিওর ২১ জন রোগী পাওয়া গেছে। ভারতে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া জেলার পাঁচলা ব্লকে শেষ পোলিও-রোগীটি পাওয়া যায় ২০১১-র জানুয়ারি মাসে—সেটাও টাইপ ১ ভাইরাসঘটিত রোগ। সেই থেকে ভারতে পোলিও রোগ আর হয়নি বটে, কিন্তু কোনও দিন যে অন্য দেশ থেকে রোগজীবাণু আসবে, তা কেউ জানে না।

তিনটে সেরোটাইপ-এর ভাইরাসের মধ্যে টাইপ ৩ হল টাইপ ১-এর তুলনায় কম আক্রমণ-ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং এক জায়গা থেকে অন্যত্র ছড়ায় কম। পৃথিবীতে শেষ টাইপ ৩ পোলিও ভাইরাস ঘটিত রোগ দেখা গেছে নাইজেরিয়ায়, ২০১২-র নভেম্বর মাসে; আর ভারতে শেষ টাইপ ৩ ঘটিত পোলিও হয়েছে ২০১০ সালে।

টাইপ ২ হল সব থেকে কম আক্রমণ-ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং একে তাড়ানো সহজতম। ১৯৯৯ সালের পর থেকে টাইপ ২-ঘটিত পোলিও সারা বিশ্বেই

খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভ্যাকসিন : আমরা দুই রকমের ভ্যাকসিন বা টিকা ব্যবহার করে থাকি—

১। মৃত জীবাণু দিয়ে তৈরি ইঞ্জেক্টেবল পোলিও ভ্যাকসিন অর্থাৎ আই.পি.ভি. (IPV)—এতে ৩ রকম সেরোটাইপের মৃত ভাইরাসই থাকে আর ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এর ফলে রক্তের মধ্যে পোলিও প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। ভবিষ্যতে বন্য পোলিও ভাইরাস রক্তে প্রবেশ করলেও এই অ্যান্টিবডি মানুষটির পক্ষাঘাত ঘটাতে দেয় না। এই পোলিও টিকা বেশিরভাগ উন্নত অথবা পোলিও-মুক্ত দেশগুলো ব্যবহার করে থাকে।

২। আমরা অবশ্য ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন বা টিকা ব্যবহার করি। এই পোলিও টিকার মধ্যে জীবিত কিন্তু কমজোরি ৩ রকম সেরোটাইপের ভাইরাসই থাকে। বন্য পোলিও ভাইরাসের মতন এই ভ্যাকসিন ভাইরাসও আমাদের অন্ত্রের ভেতরকার শ্লেষ্মাঝিল্লিতে আটকে যায়, আর সেখানে বংশবৃদ্ধি করে। শেষে বেশিরভাগই মলের সাথে বেরিয়ে গেলেও, কিছু ভাইরাস রক্তে প্রবেশ করে। এর ফলে আমাদের শরীরে দুই রকমের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে থাকে—আই পি ভি (IPV)-র মতন রক্তজনিত প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি, এবং অন্ত্রের মধ্যে আরেক রকমের প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি যেটা বন্য পোলিও ভাইরাস অন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লিতে আটকালেই তাকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে বন্য ভাইরাসের বাঁচার সব জায়গা কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু ওরাল পোলিও টিকার ফলে একটা বিশেষ সমস্যা তৈরি হতে পারে, সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করব।

পোলিও দূরীকরণ প্রচেষ্টার মূল ধাপগুলো হল—

১। বন্য পোলিও ভাইরাস খুঁজে বার করা, আর তার ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো। প্রকৃতিতে যে ভাইরাস পাওয়া যায় সেই ভাইরাস হল 'ওয়াইল্ড' বা বন্য পোলিও ভাইরাস। টিকাতে পরিবর্তিত পোলিও ভাইরাস ব্যবহার করা হয়। সুতরাং টিকার ভাইরাস থেকে প্রাকৃতিক ভাইরাসকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য প্রাকৃতিক ভাইরাসকে 'বন্য' বা 'ওয়াইল্ড' বলে ডাকার প্রথা।

২। 'বন্য' বা 'ওয়াইল্ড' পোলিও ভাইরাস যে দূর হয়েছে, সেই মর্মে সার্টিফিকেট দেবার ব্যবস্থা। এটা দু'রকম ঃ

(ক) কোনও দেশকে 'পোলিও-মুক্ত' (polio-free) ঘোষণা করার সার্টিফিকেট

(খ) যখন সারা পৃথিবীর সব দেশ থেকে পোলিও দূর করা হয়ে যাবে, তখন বিশ্ব থেকে পোলিও-দূরীকরণ (eradication) হয়েছে, এই সার্টিফিকেট। এই কথাটা সকলের মনে রাখা প্রয়োজন, কারণ ভারতবর্ষ পোলিও মুক্ত হয়ে গেলেও পোলিও টিকা ব্যবহার করে যেতে হবে যতদিন পৃথিবীর কোনও একটি দেশেও পোলিও ভাইরাস সংক্রমণ আছে।

৩। তারপর সব পোলিও টিকা উৎপাদন বন্ধ করা ও শেষে তা নষ্ট করে ফেলা। কেন? সে কথায় পরে আসছি।

চতুর্মুখী প্রকল্প

দেশকে 'পোলিও-মুক্ত' করতে, আর শেষ পর্যন্ত সারা পৃথিবী থেকে পোলিও-দূরীকরণ (eradication) করতে, একটি চতুর্মুখী প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল।

১। দেশে যে সাধারণ টিকাকরণ প্রকল্প বা রুটিন টিকাকরণ চলছে, সেটাকে চালানো ও আরও শক্তিশালী করে পোলিও-সহ সমস্ত টিকা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া।

২। পাশাপাশি অতিরিক্ত পোলিও টিকাকরণ ক্যাম্পেন, যেটা 'পালস পোলিও' টিকাকরণ বলে বেশি পরিচিত।

৩। 'আকস্মিক শিথিল পক্ষাঘাত' (Acute Flaccid Paralysis = AFP) হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে নিয়মিত নজরদারি-সমীক্ষা। AFP সাধারণত পোলিওর জন্যই হয়। তাই পোলিও ভাইরাস ছড়ানো বন্ধ হয়েছে কি না, সেটা বোঝার উপায় জনবসতিতে AFP হচ্ছে কি না সেটা যাচাই করা। মনে রাখতে হবে যে, এই জাতীয় পক্ষাঘাত পোলিও ছাড়া অন্য কিছু অসুখেরও বহিঃপ্রকাশ হতে পারে— যেমন ট্রমাটিক নিউরাইটিস, ট্র্যান্সভার্স মায়েলাইটিস ইত্যাদি। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে সমস্ত AFP রোগীকে পরীক্ষা করেও পোলিও ভাইরাস না পাওয়াটাই পোলিওমুক্ত হওয়ার সব থেকে জোরালো প্রমাণ।

৪। 'ঝাড়ু-দেওয়া' টিকাকরণ (Mop-up Immunisation)—AFP-র নজরদারি-সমীক্ষার ফলে পোলিও রোগ ধরা পড়লে সেই এলাকায় জোরদার ভাবে পোলিওর নিবিড় টিকাকরণ করার ব্যবস্থাকে 'মপ-আপ' বা 'ঝাড়ু-দেওয়া' টিকাকরণ বলে। তবে এটা কেবল তখনই ফলপ্রসূ যখন ভাইরাসটা একটা ছোট জায়গার মধ্যেই ছড়াচ্ছে অথবা সীমিত থাকছে।

এবার দেখি এত সব করে কত দূর ফল পাওয়া গেছে। নীচে ভারত ও পৃথিবীতে পোলিও রোগীর সংখ্যা দেওয়া হল। সব সালের তথ্য দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাতে মূল ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হবে না।

সাল	ভারত	বিশ্ব
১৯৮৮	২৪,৫০০০	৩৫,০০০০
১৯৯৮	১৯৩৪	৬৩৪৯
২০০৫	৬৬	২০৩০
২০০৭	৮৭৪	১৩৮৭
২০১০	৪২	১৩৫২
২০১১	১	৬৫০
২০১২	০	২২৩
২০১৩ (১ অক্টোবর পর্যন্ত)	০	২৮৭

ভারতকে পোলিও-মুক্ত করতে এত সময় লাগল কেন?

১। নিয়মিত টিকাকরণ ব্যবস্থার দুর্বলতা—১৯৬১ সালে কিউবা পৃথিবীতে প্রথম 'পোলিও-মুক্ত দেশ' বলে স্বীকৃতি পায়। সে দেশে অন্য সব টিকার ('রুটিন অর্থাৎ নিয়মিত টিকাকরণ') সাথে সাথে পোলিও টিকা দেওয়া হয়, এবং তাতেই প্রায় ১০০ শতাংশ মানুষকে টিকাকরণ সম্ভব

হয়। কিন্তু ভারতে অনেক দিন পর্যন্ত 'রুটিন টিকাকরণ' প্রকল্প ঠিকমত চলেনি। জনসাধারণের একটা বড় অংশ এর আওতার বাইরে থেকে গিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের জনসংখ্যা বিশাল, আর এই দুই প্রদেশে শিশুদের বড় একটা অংশ টিকা একবারও নেয়নি, বা আংশিকভাবে নিয়েছিল। ফলে সেখানে পোলিও তো থেকে গেলই, আবার সেখানকার মানুষ যখন অন্যান্য প্রদেশে গেলেন, তাঁদের সঙ্গে পোলিও ভাইরাসও সেখানে গেল। মহারাষ্ট্র, দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গ এর ফলে বেশ পোলিওতে ভুগেছে। সুদূর তাজিকিস্তান থেকে প্রতিবেশি নেপাল—এইসব দেশে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে শ্রমিকরা গিয়েছেন, পোলিও ভাইরাসও ছড়িয়েছে।

২। সচেতনতার অভাব এবং স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ওপর আস্থার অভাব—এর ফলে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গে বহু অঞ্চলেও মানুষ টিকা নিতে চাননি। ফলে ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, এবং ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া অব্যহত থেকেছে।

৩। অপ্রতুল স্বাস্থ্যবিধান (sanitation) আর নিরাপদ পানীয় জলের অভাব—এর ফলে কেবল পোলিওই নয়, অন্য সব ভাইরাস ঘটিত পেটের রোগ ছড়িয়েছে। এই সব অন্ত্রনিবাসী ভাইরাস বারবার ডাইরিয়া রোগ ঘটানোর পাশাপাশি, পোলিও টিকা দেওয়া সত্ত্বেও পুরো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

কোনও পরিবর্তনের ফলে এইটুকু সাফল্য অর্জিত হল?

১। রাজনৈতিক আর প্রশাসনিক প্রচেষ্টা বাড়ানোর ফলে পোলিও টিকা বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারল, আর টিকার গুণমান বজায় থাকল। স্বাস্থ্যবিধান (sanitation)-এর কিছু উন্নতি ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা কিছুটা হলেও হয়েছে, যদিও বিশেষ করে শহুরে বস্তি-অঞ্চলে এখনও অনেক ঘাটতি থেকেই গেছে।

২। নির্দিষ্ট অভিমুখে নজরকাড়া প্রচার আর তার সঙ্গে জনসেবা ব্যবস্থা পৌঁছনর (Public Service Delivery) কিছুটা উন্নতি, এই দুটো প্রচেষ্টার ফলে মুখে খাবার পোলিও টিকা নিয়ে জনমনে যে অনাস্থা বা ভয় তৈরি হয়েছিল, তা দূর করা বা কমানো গেছে।

৩। মনোভ্যালেন্ট (mOPV) ও বাইভ্যালেন্ট (bOPV) মুখে খাবার পোলিও টিকা প্রচলন শুরু হয় ২০০৫ সালে, এবং এর ফলে টিকাগ্রহণকারীর শরীরে বেশি প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। যে টিকা আমরা এত দিন ব্যবহার করে এসেছি সেটা ছিল ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা, অর্থাৎ তা তিনটে টাইপের পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধেই মানবশরীরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আর মনোভ্যালেন্ট-১ (mOPV-1) টিকা কাজ করে কেবল সেরোটাইপ ১ পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধে, আবার মনোভ্যালেন্ট-৩ (mOPV-3) টিকা কাজ করে কেবল সেরোটাইপ ৩ পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধে। বাইভ্যালেন্ট (bOPV) টিকা কাজ করে সেরোটাইপ ১ ও সেরোটাইপ ৩ পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধে। মনোভ্যালেন্ট-১ টিকা দিয়ে 'পালস পোলিও' অতিরিক্ত কয়েকটা প্রোগ্রাম ২০০৬ সালে ৬৪৮টা টাইপ ১ পোলিওর সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে ২০০৭ সালে মাত্র ৮৩ তে নামিয়ে আনে। টাইপ ১ পোলিও ভাইরাসের দ্বারা আমাদের দেশে (ও বিশ্বে) অধিকাংশ রোগ হয়, তাই এটা খুব দরকারি ছিল। এর ফলে যদিও টাইপ ৩ পোলিও ভাইরাসের দ্বারা পোলিও রোগ সাময়িকভাবে বেশ বেড়ে গেল, কিন্তু সেটাকে ২০০৭ সাল থেকে মনোভ্যালেন্ট-৩ (mOPV-3) টিকার কয়েকটি মাত্র রাউন্ড দিয়েই দূর করা গেল। ২০১০ থেকে ভারতে যে সব রাজ্য ও জেলায় পোলিও এখনও তুলনায় বেশি অথবা যেখানে পোলিও হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হয়, সেখানে বিশেষ অতিরিক্ত পালস পোলিও প্রোগ্রামে বাইভ্যালেন্ট টিকা চালানো হচ্ছে। ভারতে জাতীয় স্তরে কিন্তু পালস পোলিও প্রোগ্রামে বা রুটিন টিকাদানে পুরনো ট্রাইভ্যালেন্ট টিকাই চলছে।

২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত পোলিও মুক্ত সার্টিফিকেট পাবে। আমরা কি নিশ্চিন্ত?

না। নিশ্চিন্ত হব কী করে, যেখানে—

১। ভারতের অভ্যন্তরে পোলিও ভাইরাস সংক্রমণ হয়ে নতুন পোলিও কেস ২০১১ সাল থেকেই ঘটেনি। কিন্তু অন্য দেশ থেকে বন্য ভাইরাস আসতে পারে, যেহেতু অন্য সব দেশে পোলিও দূর হয়নি, বা দূর হয়েও পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

২। বন্য পোলিও ভাইরাস থাকবে না। আমাদের শরীরে এই ভাইরাস ঢুকলেই পোলিও রোগ হত না, অধিকাংশের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্ম নিত। এখন পোলিও নির্মূল হলে সেটা ঘটবে না। ফলে টিকাকরণ ছাড়াই সাধারণ্যে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা এখন আছে, তা কমবে বা লোপ পাবে। ফলে বাইরের দেশ থেকে আসা পোলিও ভাইরাস সহজে আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারবে।

৩। অথচ রোগ থাকবে না বলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা যাঁরা পরিচালনা করেন, যারা স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, এবং জনসাধারণ— সকলের মধ্যে পোলিও ব্যাপারে ঢিলেমি দেখা দেবে। কিন্তু টিকাকরণ চালিয়ে না গেলে অনেকেই টিকা পাবেন না বা নেবেন না। তাঁদের পোলিও রোগ হতে পারে, শুধু তাই নয়, রোগ না হলেও তাঁদের শরীরে পোলিও ভাইরাস বাসা বেঁধে বৃদ্ধি পাবে ও ছড়িয়ে পড়বে।

৪। 'টিকা থেকে বিবর্তিত পোলিও ভাইরাস' (Vaccine-Derived Polio Viruses বা VDPV) থেকে 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত' (Vaccine-Associated Poliomyelitis বা VAPP)-এর উৎপত্তি হল মুখে খাবার জীবিত (কিন্তু কমজোরি ভাইরাসঘটিত) টিকা ব্যবহারের ফল।

প্রথম তিনটে সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে সকলে একমত। কিন্তু 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত'-এর মোকাবিলা কী ভাবে করা হবে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বিশেষ করে ভারতকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করা হলে কী নীতি নেওয়া উচিত, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

'টিকা থেকে বিবর্তিত পোলিও ভাইরাস' (Vaccine-Derived Polio Viruses) ও তা থেকে 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত'—

মুখে খাবার পোলিও টিকায় জীবিত পোলিও ভাইরাস থাকে। বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই ভাইরাসের রোগ ঘটানোর ক্ষমতা লোপ করা হয়, কিন্তু তার অন্য গুণ বজায় থাকে। মুখে খাওয়ার পর সেই ভাইরাস আমাদের অন্ত্রের ভেতরকার শ্লেষ্মাঝিল্লিতে আটকে যায়, আর সেখানে বংশবৃদ্ধি

করে। তারপর প্রচুর সংখ্যায় ভাইরাস মলের সঙ্গে দেহের বাইরে আসে। সেটা ভাল ব্যাপার, কেন না তারা পরিবেশে বন্য পোলিও ভাইরাসকে কমিয়ে দেয়, এবং কোনও মানুষ যদি ওই মলদূষিত খাদ্য-পানীয়ের মাধ্যমে ওই টিকা-ভাইরাসটা খেয়ে ফেলেন, তাঁর দেহে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। কিন্তু সমস্যা হল, বংশবৃদ্ধি করার সময়ে রোগ ঘটাতে অসমর্থ কমজোরী এই ভাইরাসের জেনেটিক পরিবর্তন হয়ে তা বন্য ভাইরাসে পরিণত হতে পারে। এ যেন গৃহপালিত কুকুর, জেনেটিক পরিবর্তনের ফলে তার আদিম পূর্বসূরি নেকড়ের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠল। টিকা-ভাইরাসের চেয়ে অল্প সংখ্যায় হলেও, এই নতুন বন্য ভাইরাস অন্য কাউকে আক্রমণ করতেই পারে, যিনি পোলিও টিকা নেননি। ফলে 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত' হতে পারে এই আক্রান্ত মানুষটির।

ব্যাপারটা কতটা ভয়ের বা বিপজ্জনক তা ঠিকভাবে বিচার করতে গেলে কয়েকটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর চোখ বোলানো দরকার। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যখন প্রথম মুখে খাবার পোলিও টিকা দেওয়া শুরু হল, তখন ২৫ লক্ষ শিশুর মধ্যে একজনের 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত' হয়েছিল। তারপর যত বেশি বার পোলিও টিকা নেওয়া হয়েছে, এই সংখ্যাটা সেই অনুপাতে ঠিক ততটা বাড়েনি।

ভারতে ২০১০ সাল থেকে কী ঘটেছে?

- ২১৬৬৬৯ জন 'আকস্মিক শিথিল পক্ষাঘাত' (Acute Flaccid Paralysis বা AFP) রোগীকে পরীক্ষা করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তার মধ্যে ১৮ জনের 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত' হয়েছিল। আর সাধারণ পোলিও রোগ অর্থাৎ বন্য পোলিও ভাইরাসের আক্রমণে পোলিও হয়েছিল ৪৩ জনের, মানে টিকার পোলিওর চাইতে আড়াইগুণ বেশি।
- পাঁচ বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের ৬৮৮,০০০,০০০টা মুখে খাবার পোলিও টিকার ডোজ পড়েছে, আর তার ফলে ১৮ জনের 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত' হয়েছে। অন্য কথায়, ২ কোটি ৮২ লক্ষ টিকাদান-পিছু একটা এই বিশেষ পোলিও রোগ।
- ওই ১৮ জন 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত'-এর মধ্যে ১৭ জনেরই টাইপ ২ ভাইরাসের জন্য পোলিও, মাত্র ১ জনের টাইপ ৩ ভাইরাসের জন্য পোলিও। একটা বিষয় এর পেছনে থাকা খুব সম্ভব। বাইভ্যালেন্ট টিকা, যার মধ্যে টাইপ ১ আর টাইপ ৩ ভাইরাস (কমজোরী করা টিকা ভাইরাস) থাকে, সেটা দেওয়া হয়েছিল আট রাউন্ড। আর ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা, যাতে টাইপ ২ ভাইরাস (কমজোরী করা টিকা ভাইরাস) থাকে, সেটা দেওয়া হয়েছিল মাত্র দু'রাউন্ড। এরই ফলে হয়ত টাইপ ২ পোলিওর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্য টাইপগুলোর তুলনায় কম গড়ে ওঠে, আর সেকারণেই টাইপ ২ দ্বারা VAPP বেশি হয়।

সুতরাং 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত'-এর সম্ভাবনা সেখানেই বেশি যেখানে টিকাকরণ দিয়ে মানুষের বড় অংশকে প্রতিরোধযুক্ত করা যায়নি। যদি আশেপাশে এমন অঞ্চল থাকে যেখানে টিকাকরণ ভাল ভাবে করা হয়েছে, তা হলে অ-টিকাকৃত অঞ্চলে মানুষের এই ধরনের পোলিও হবার সম্ভাবনা আরও বেশি। কেন না বেশিবার টিকাপ্রাপ্ত এলাকার শিশুদের মলে 'টিকা থেকে বিবর্তিত পোলিও ভাইরাস' থাকার সম্ভাবনা বেশি। সেই ভাইরাস পার্শ্ববর্তী কম টিকাপ্রাপ্ত এলাকার শিশুদের পানীয় জল বা খাদ্যকে সহজে দূষিত করতে পারে, এবং 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত' ঘটাতে পারে। যাদের শরীরে 'টিকা থেকে বিবর্তিত পোলিও ভাইরাস' উৎপন্ন হল, তারা কিন্তু সেই ভাইরাসে রোগগ্রস্ত হবে না, কেন না ওই টিকা তাদের যে প্রতিরোধ-ক্ষমতা দিয়েছে তা এই নতুন ভাইরাসের বিরুদ্ধেও কার্যকর।

মৃত পোলিও ভাইরাস টিকা (Inactivated Polio Vaccine, IPV) কি মুখে খাবার কমজোরী জীবিত পোলিও ভাইরাস সমন্বিত টিকার (Oral Polio Vaccine, OPV) চাইতে ভাল?

আসুন, এ দু'য়ের ইতিবাচক আর নেতিবাচক দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখি—

	মুখে খাবার পোলিও টিকা (OPV)		মৃত পোলিও ভাইরাস টিকা (IPV)	
+	অন্ত্র এবং রক্ত—দু'টো জায়গাতেই প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে, এবং রোগহীন জীবাণু-বাহক দশা আটকায়	+	কেবল রক্তে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে, এবং রোগহীন জীবাণু-বাহক দশা আটকায় না	-
+	মুখে দেওয়া হয় বলে তেমন দক্ষ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী লাগে না	+	ইঞ্জেকশন করে দিতে হয় বলে দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী লাগে, ইঞ্জেকশন দেবার জন্য জীবাণুমুক্ত ব্যবস্থা লাগে এটা ভারতের মতো দেশে খুবই সমস্যা	-
+	খরচ কম	+	OPV-র চেয়ে দশগুণ দামি	
+	গণ-টিকাকরণ করলে সেই অঞ্চলে যাঁরা টিকা নেননি তাঁদেরও প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়ে	+	মলে টিকা ভাইরাস বের হয় না, ফলে কেবল টিকাপ্রাপ্ত শিশু ছাড়া প্রতিবেশিদের কোনও উপকার হয় না।	-
-	IVP-র তুলনায় কম শক্তিশালী, ফলে বারবার টিকা দিয়ে তবেই যথেষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা পাওয়া যায়।	-	OPV-র তুলনায় বেশি শক্তিশালী, ফলে একবার টিকা দিয়েই যথেষ্ট প্রতিরোধ-ক্ষমতা পাওয়া যায়	+
-	'টিকা থেকে বিবর্তিত পোলিও ভাইরাস' (VDPV) দ্বারা 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত' (VAPP)-এর সম্ভাবনা আছে।	-	'টিকা থেকে বিবর্তিত পোলিও ভাইরাস' দ্বারা 'টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত'-এর সম্ভাবনা নেই।	+

পোলিও নির্মূলকরণের জন্য গণ টিকাকরণের ক্ষেত্রে মুখে খাবার পোলিও টিকা তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম পছন্দের টিকা। ইজরায়েলের মতো যে সব দেশ কেবলমাত্র ইঞ্জেকশন টিকা (মৃত ভাইরাস টিকা) ব্যবহার করে এসেছে, তাদের এখন 'নীরোগ রোগবাহক' নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। এঁদের অন্ত্রে পোলিও ভাইরাস আছে, ইঞ্জেকশন টিকা নিয়েছেন বলে শরীরে সেই ভাইরাস রোগ তৈরি করতে পারছে না। কিন্তু মলের সঙ্গে সেই ভাইরাস বেরোচ্ছে। ফলে তাঁর কাছাকাছি কেউ যদি টিকা না নেন, তবে তাঁর পোলিও হওয়ার বিপদ থাকছে।

এই মুহূর্তে ইঞ্জেকশনে মৃত ভাইরাস টিকা ব্যবহারের আরেকটা অসুবিধা হল, আমাদের দেশের সব বাচ্চাকে দেওয়ার মতো ওই টিকার উৎপাদন ক্ষমতা নেই। টিকা তৈরি করার ব্যবস্থা করতে হবে, আর সেটা সময় সাপেক্ষ। সেই টিকা-কারখানার 'ভাল প্রক্রিয়া পদ্ধতি' (GMP) মানা অত্যাবশ্যক; সেটা একদিনে করা সম্ভব নয়। (The Global Alliance for Vaccine Initiative, সংক্ষেপে GAVI) এর একটা পরিকল্পনা করেছে। ধাপে ধাপে এগনো হচ্ছে।

ভুললে চলবে না, যে কোনও দেশের জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচিতে কোন টিকা স্থান পাবে, তা ঠিক করার কয়েকটি নির্দিষ্ট যোগ্যতামান আছে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে সেটা অনুসরণ করা খুব জরুরি। সেই মানদণ্ড অনুসারে, টিকাটি সেই রোগের জন্য হবে যা সে দেশের জনস্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করছে, টিকাটি একই সঙ্গে যথেষ্ট কার্যকর ও নিরাপদ হবে, আর সেটা সবার হাতের নাগালে থাকবে।

ইঞ্জেকশন-দ্বারা মৃত ভাইরাস টিকা (IPV) প্রয়োগ করতে গেলে দশগুণ বেশি টাকা লাগবে। সেই অর্থ কোথা থেকে আসবে সেটা নিয়ে ঠিকঠাক ব্যবস্থা না করে সেখানে এগনো ঠিক হবে না। ততদিন পর্যন্ত মুখে খাবার পোলিও টিকা আমাদের নাগালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়।

পোলিও ভাইরাস যাঁদের আক্রমণ করে তাঁদের মধ্যে হাজারে একজনেরও পোলিও রোগ হয় না; সুতরাং 'বায়োটেররিজম'-এর অস্ত্র হিসাবে সেটা খুব পছন্দসই নয়। কিন্তু জীবাণুটা আছে এমন সব জায়গা থেকে সেটা যেন কোনওভাবেই পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেটা দেখতেই হবে।

পোলিও নির্মূল করার শেষ অঙ্কের রণনীতি—

১। সারা দেশব্যাপী ট্রাইভ্যালেন্ট মুখে খাবার টিকা ব্যবহার—এটা জনসাধারণের মধ্যে সব টাইপের পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখার সেরা উপায়। বর্তমান উচ্চ টিকাকরণ সংখ্যা ও মান বজায় রাখলে 'টিকা থেকে বিবর্তিত পোলিও ভাইরাস' (VDPV) দেহে তৈরি হলেও সেটা রোগ ('টিকা সম্পর্কিত পোলিও-পক্ষাঘাত' বা VAPP) তৈরি করতে পারবে না।

২। রুটিন টিকাকরণ পদ্ধতি দ্বারা আরও ভাল ভাবে সবার কাছে পৌঁছতে হবে। তাতে টিকা দ্বারা আটকানো যায় এমন অন্যান্য সংক্রামক রোগের ভারও কমবে।

৩। ২০১৪ সালের শেষ দিকে নাগাদ ইঞ্জেকশন-দ্বারা 'মৃত পোলিও ভাইরাস টিকা' (IPV) প্রয়োগ রুটিন টিকাকরণের অঙ্গ হিসাবে নেওয়া হবে। অবশ্য মুখে খাবার ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা দেওয়া একই সাথে চলবে।

৪। ২০১৬ সাল থেকে ট্রাইভ্যালেন্ট পোলিও টিকা, যাতে টাইপ ২ ভাইরাস (কমজোরী) থাকে, সেটা বন্ধ করে কেবল বাইট্রাইভ্যালেন্ট পোলিও টিকা (টাইপ ১ ও টাইপ ৩ ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর) দেওয়া হবে।

৫। ২০১৮ সালে পোলিও টিকাকরণ বন্ধ করা হবে, এবং যে সব প্রতিষ্ঠানে পোলিও ভাইরাস নিয়ে কাজ করা হয়, সেগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হবে। শেষ কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। পোলিও ভাইরাস যাঁদের আক্রমণ করে তাঁদের মধ্যে হাজারে একজনেরও পোলিও রোগ হয় না; সুতরাং 'বায়োটেররিজম'-এর অস্ত্র হিসাবে সেটা খুব পছন্দসই নয়। কিন্তু জীবাণুটা আছে এমন সব জায়গা থেকে সেটা যেন কোনওভাবেই পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেটা দেখতেই হবে। ছড়িয়ে পড়লে পোলিও-নির্মূলকরণ, যেটা বিশ্বে ২০০০ সালেই হওয়ার কথা ছিল, সেটা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যাবে।

ওপরের ৩, ৪ বা ৫ নম্বর রণনীতিতে কিছু কাজ একটি নির্দিষ্ট সময়ে করা হবে, বলা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু অনিশ্চয়তা তো আছেই। ধরুন, কোনও দেশ তাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচি সফল করতে পারল না, বা একটি দেশ থেকে জীবাণু অন্য দেশে গিয়ে রোগ ছড়াল। সেই সব সম্ভাবনা মাথায় রেখেই এই রণনীতি। ততদিন পর্যন্ত বিশ্বের প্রথম পোলিওমুক্ত দেশ কিউবার সঙ্গে সঙ্গে বাকিদেরও পোলিও টিকা ব্যবহার করে যেতে হবে।

এটা হল বর্তমান অবস্থায় যতটা করা সম্ভব, ততটুকু ভাল।

লেখক পরিচিতি : ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক কর্মসূচি রূপায়ণে কর্মরত।

সুস্থ থাকার ব্যায়াম

(পর্ব ২)

সুস্থ বলতে যদি নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কথা ভাবেন, তো তার জন্য ব্যায়াম একরকম। আবার যদি আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি আর তেত্রিশ ইঞ্চি বাইসেপস বাগানোর তাল করেন, তা হলে অন্য রকম। রোগবালাই দূরে রেখে বহু দিন বাঁচার বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা দিচ্ছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রি।**

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-র আগের সংখ্যায় (অক্টোবর ২০১৩) পর্ব ১-এ দেখেছি, দ্রুত হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, ফুটবল খেলা, সাইকেল চালানো, ব্যাডমিন্টন বা টেনিস খেলা—দৈনিক এক-আধ ঘণ্টা এই সব করলে আদর্শ অ্যারোবিক ব্যায়াম হবে। আর যাবতীয় শরীরচর্চার মধ্যে অ্যারোবিক ব্যায়াম হল সুস্থ থাকার চাবিকাঠি। এবার দেখি, কেন অ্যারোবিক বিনে গতি নেই।

পরিশ্রম ও ব্যায়াম :

আমার অনেক রোগীই বলেন, আমি তো এমনিতেই অনেক পরিশ্রম করি, তার ওপর আবার ব্যায়াম করার দরকার কীসের? গৃহবধূ বলেন, দিনরাত্তির হাঁড়ি ঠেলছি, ঘর মুছছি, তবু মোটা হচ্ছি কেন? ইঞ্জিনিয়রবাবু বলেন, সারাদিন সাইটে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছি, তার ওপর আবার ব্যায়াম! অফিসের কেরাণিবাবু বলেন, বসের ঠেলায় অফিসে আর বৌয়ের ঠেলায় বাড়িতে চরকিপাক মারতে হয়, আমাকে ব্যায়াম করতে বলবেন না। বস বলেন, সারাদিনরাত কেবল অফিসের জন্য ঘুরছি, ফিরতে রাত নটা, ব্যায়াম করলেই বরং আগে টেঁসে যাব।

কাজের খাতিরে এই যে পরিশ্রম, একটু ভেবে দেখলেই বুঝবেন, তাতে অ্যারোবিক ব্যায়ামের পুরো সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। কাজের সময় খানিক খানিক করে কিছু পেশির সঞ্চালন হয়। কিন্তু আমরা আদর্শ অ্যারোবিক ব্যায়াম কী হবে, সে প্রশ্নের উত্তরে দেখেছি, এক দফায় অন্তত ৩০ মিনিট তীব্র, হৃদস্পন্দন-হার বাড়ানো ব্যায়াম, যাতে শরীরের সমস্ত বড় মাংসপেশিগুলোকে খাটাতে হবে। এটা ওপরের কোনও কাজের জন্য করা হয় না। রিকশচালক অনেক সময় কাজের খাতিরেই এরকম ব্যায়াম করেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মানসিক উৎকণ্ঠার একটা ব্যাপার থাকে; সে কথায় পরে আসছি। তবে এটুকু বলাই যায়, অন্যান্য ব্যাপার, যেমন সঠিক পুষ্টি, নেশা না করা, দুশ্চিন্তা কম করা—এই সব শর্তপূরণ করলে রিক্সাচালকদের স্বাস্থ্য অফিসে বসে কাজ করা মানুষের চেয়ে ভালই হওয়ার কথা। অন্যদের ক্ষেত্রে কাজের জন্য যেটুকু পেশিসঞ্চালন হয়, তাতে একনাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অক্সিজেন ব্যবহার করার ক্ষমতার উর্দ্ধসীমা বা VO_2 Max-এর কাছাকাছি থাকা হয় না। কাজের খাতিরে পেশিসঞ্চালন সেই তীব্রতায় পৌঁছয় না, বা পৌঁছলেও কম সময়ের জন্য ততটা তীব্র থাকে। সত্যি কথা বলতে কী, অ্যারোবিক ব্যায়াম করার পাঁচ-সাত মিনিট পরে যখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও 'ভারী' হয়ে আসে, তখন থেকে ব্যায়ামের আসল সুফল শুরু হয়। হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও রক্ত-সংবহনের ওপর ব্যায়ামের পুরো সুফল পেতে গেলে এর পর থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট একই রকম দ্রুত ছন্দে অ্যারোবিক ব্যায়াম চালিয়ে যেতে হবে। কাজের সময় এটা হয় না। আরও একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, সেটা হল কর্মক্ষেত্রে মানসিক উৎকণ্ঠাজনিত। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কাজের সময় করা পরিশ্রমের চাইতে অবসর সময়ে করা শারীরিক পরিশ্রমে উপকার অনেক বেশি। বাহান্নটি দেশে হৃদরোগ সদ্য-ধরা পড়েছে এমন ১০০৪৩ জন মানুষের ওপর চালানো একটি সমীক্ষায় এই তথ্য পাওয়া গেছে (Intraheart Study, European Heart Journal 2012, Vol 33, p. 452-466)।

তা হলে আরও একটা কথা আমরা বলতে পারি। অ্যারোবিক ব্যায়াম স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের মানুষের জন্য ভাল, আবার তা হৃদরোগ থাকলে করা যাবে না এরকম কিছু জিনিস নয়। বরং হৃদরোগীরা এই ব্যায়াম করতে পারবেন, কিন্তু তার আগে তাঁদের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, এবং ধীরে ধীরে ও সাবধানে ব্যায়ামের মাত্রা বাড়াতে হবে। উচ্চ-রক্তচাপের রোগীদের জন্য একই কথা প্রযোজ্য। তাঁদের ব্যায়াম করা দরকার, এবং তাঁরা অধিকাংশ সময়ে ব্যায়ামের মূল্য ঠেকে শেখেন বলে ব্যায়াম চালিয়ে যান। ডায়াবেটিসের রোগীরাও অ্যারোবিক ব্যায়াম করবেন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের মানুষের মতো করেই, কিন্তু তাঁদের পায়ে চট করে ঘা হয়ে যেতে পারে বলে সঠিক জুতো পরা ও পায়ের যত্ন খুব দরকার— প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। ডায়াবেটিসের রোগীদের আর একটা কথা মনে রাখতে হবে— ব্যায়ামের ফলে তাঁদের রক্তে শর্করার পরিমাণ যেন খুব কমে না যায়। অর্থাৎ হৃদরোগী, উচ্চ-রক্তচাপের রোগী ও ডায়াবেটিসের রোগী—এঁদের অ্যারোবিক ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে, এবং তাঁরা সেটা করতেও পারেন, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।

তার মানে কি এই যে দিনে ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা অ্যারোবিক

ব্যায়াম না করলে কিচ্ছু লাভ নেই? না, তা নয়। আমি সর্বোচ্চ লাভ পাওয়ার কথা বলছি। এটা দেখা গেছে দিনে এক ঘণ্টার বেশি অ্যারোবিক ব্যায়াম চালিয়ে গেলে অতিরিক্ত লাভ কিছু হয় না। আবার অন্যদিকে, অনেক রোগীর পক্ষে এতটা ব্যায়াম অসম্ভব হতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অ্যারোবিক ব্যায়াম কম করে করলেও লাভ আছে। যেমন জামাইকায় ১২৮ জন সেরিব্রাল স্ট্রোকের (ব্রেন স্ট্রোক) রোগীর ওপর চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিয়মিত ঘরের বাইরে যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটা আর ঘরে বসে ম্যাসাজ করা—এই দু'দলের মধ্যে প্রথম দল হাঁটার ফলে জীবনযাত্রার অনেক বেশি মানোন্নয়ন করতে পেরেছেন। আর তাঁদের হৃদযন্ত্রের ক্ষমতা বেড়েছে, ফলে বিশ্রামকালীন হৃদস্পন্দন-হার কমেছে। বাইপাস সার্জারি করার পর কর্মক্ষমতা-বৃদ্ধিতে ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অ্যারোবিক ব্যায়াম কার্যকর।

শরীরচর্চা ও রোগপ্রতিরোধ :

হৃদরোগের এতাবৎ জানা কারণগুলোর মধ্যে শরীরচর্চার অভাব অন্যতম, অথচ একেবারে অবহেলিত। ধূমপান, ডায়াবেটিস, উচ্চ-রক্তচাপ ও স্থূলতার মতো শরীরচর্চার অভাব হৃদরোগ ডেকে আনে, কিন্তু শরীরচর্চার গুরুত্ব কেউই সে ভাবে দেন না। বোধ হয় এটা আমাদের সস্তায় বাজিমাত করার প্রবণতার বিপক্ষে যায় বলেই এই অবহেলা। অথচ শরীরচর্চা নিজে হৃদরোগ আটকায়, আবার মেদ বা স্থূলতা কমিয়ে হৃদরোগের প্রতিরোধে আলাদা করে অবদান রাখে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় বললে 'ডাবল বেনিফিট স্কিম' হল 'ফিটনেস স্কিম'!

দু'চারটে তথ্য দেখা যাক। যাঁরা নিয়ম করে ব্যায়াম করেন না, কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য জীবনযাত্রা করেন, তাঁদের হৃদরোগে ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের মৃত্যুর হার ৩০% ভাগ কম (রিকশচালকদের উদাহরণটা মনে আছে আশা করি)। ২২টা উচ্চমানের সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, হার্ট অ্যাটাকের পরে নিয়ন্ত্রিত অ্যারোবিক শরীরচর্চা করলে শতকরা ২২ ভাগ মানুষের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হয়, এবং শতকরা ২৫ ভাগের হঠাৎ-মৃত্যু আটকানো যায় (O'Connor 1988, Oldridge 1989)। এটাই স্বাভাবিক। নিয়মিত অ্যারোবিক শরীর চর্চার ফলে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রিয়ার উন্নতি হয়। তখন হৃদযন্ত্র এক-একবার সংকোচন-প্রসারণ করে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন পাঠাতে পারে। আবার, পেশিতে রক্ত আহরণ করার ক্ষমতা বাড়ে। এই দুটোর সম্মিলিত ফল হল, হৃদযন্ত্র তুলনায় কম গতিতে কাজ করে সর্বত্র অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। ফলে রোগীর কর্মক্ষমতা বাড়ে, জীবনযাত্রার মান বাড়ে। হৃদস্পন্দন-হার কমে যাওয়াতে করোনারি ধমনী, যার কাজ হল হৃদপেশিতে রক্ত সরবরাহ করা, তাদের কাজ কমে। প্রাণঘাতী যে হৃদরোগে আজকাল বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন, সেটি হল করোনারি ধমনীর অসুখ, সেই অসুস্থ ধমনীর কাজ কমা মানেই মৃত্যুর সম্ভাবনা কমে যাওয়া। এছাড়াও নিয়মিত অ্যারোবিক শরীরচর্চার ফলে কম মাত্রার ওষুধেই রোগী ভাল থাকেন।

শরীরচর্চা, মেদহ্রাস ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি :

আমাদের শরীর যেন এক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। যত ক্যালোরি জমবে, আমাদের ওজন ততই বাড়বে। ক্যালোরি বা শক্তি আসে খাদ্য থেকে। আর ক্যালোরি খরচ হয় শারীরিক পরিশ্রমে। আমাদের খাদ্যাভ্যাস ভীষণ বদলে যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে একেবারে ছোটবেলা থেকেই উচ্চ-ক্যালোরিযুক্ত খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি আমরা। অন্য দিকে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের টাকা কমানোর উপায় যেমন টাকা খরচ করে ফেলা, তেমনই মেদ ঝরানোর উপায় হল ক্যালোরি খরচ—অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম। এর কোনও শর্টকাট রাস্তা নেই। পাতিলেবু, মধু বা টক দই কখনই ক্যালোরি খরচ করিয়ে দিতে পারে না, ঠিক যেমন আপনার ব্যাঙ্কের পাসবই-এর ওপর সাতটা বা সতেরোটা দাগ দিয়ে আপনার জমা টাকা কমানো সম্ভব নয়। তবু মানুষ ভোলে, বিনা পরিশ্রমে ফল লাভের ইচ্ছে তো খালি পরীক্ষার আগের রাতে ফাঁকিবাজ ছাত্রের একচেটিয়া নয়। কিন্তু পরিশ্রম ছাড়া মেদ ঝরবে না। আর এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ পরিশ্রম হল অ্যারোবিক ব্যায়াম। তবে সেটাতেও বেশ খাটুনি আছে। একজন ৭০ কেজি ওজনের মানুষ যদি একটা সিঙাড়া (মোটামুটি ৩০০ ক্যালোরি) খেয়ে সেই ক্যালোরিটা খরচ করতে চান তো ঘণ্টায় চার কিলোমিটার বেগে প্রায় দেড় ঘণ্টা হাঁটতে হবে। আর এই হিসেবটা সব সময়ের জন্যই সত্যি। কিছুদিন মেপে খেলাম, হাঁপিয়ে হাঁটলাম, তারপর কষে ঘুমোলাম আর খেলাম—এটা করলে হা-হুতাশই করতে হবে। আর বিভিন্ন কর্পোরেট-কালচার পোষিত 'ডায়েট'-এ সাময়িকভাবে ওজন কমে

•••••••••

ডায়াবেটিসের রোগীরাও অ্যারোবিক ব্যায়াম করবেন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের মানুষের মতো করেই, কিন্তু তাঁদের পায়ে চট করে ঘা হয়ে যেতে পারে বলে সঠিক জুতো পরা ও পায়ের যত্ন খুব দরকার— প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। ডায়াবেটিসের রোগীদের আর একটা কথা মনে রাখতে হবে— ব্যায়ামের ফলে তাঁদের রক্তে শর্করার পরিমাণ যেন খুব কমে না যায়।

•••••••••

ঠিকই, কিন্তু ডায়েট ছাড়লেই ফিরে আসে মেদ। লাইপোসাকশান ও কসমেটিক সার্জারিতে সাময়িক ওজন ও মেদ কমে। বেরিয়াট্রিক সার্জারিতে বিপুল অর্থব্যয়ের বিনিময়ে মেদ স্থায়ীভাবে ঝরানো গেলেও তার 'সাইড এফেক্ট' কম নয়। 'ডায়েট' ও ফ্যাট কমানোর নানা কাজের ও অকাজের উপকরণ ও উপদেশ বিক্রি করে বিপুল অর্থের আমদানি হচ্ছে, তাই কাগজে-টিভিতে-ম্যাগাজিন সে সবের বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ। কিন্তু আপনি নিজের মনে দৌড়লে বা সাঁতার কাটলে আর কার ক'টাকা লাভ বলুন, তাই এগুলোর কোনও বিজ্ঞাপন নেই। বিজ্ঞাপনে কী না হয়। যেমন বাজারে

'মর্নিং ওয়াকার' বলে অতি চমৎকার একটি দ্রব্য বেরিয়েছে। আপনি শুয়ে শুয়ে পা'টা দয়া করে তার ঘাড়ে রাখবেন, সেটি ১৫০০ পা (মতান্তরে ২২২২ পা) হাঁটার সুফল আপনার অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবে। এসব বিজ্ঞাপন পড়ার সময় খালি সেই ঋষিবাক্যটি খেয়াল রাখবেন, চালাকির দ্বারা কোনও সুকর্ম হয় না, আপনার মেদ ঝরাও হবে না।

অ্যারোবিক শরীরচর্চায় আমাদের কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে। অ্যানঅ্যারোবিক ব্যায়ামে পেশির শক্তি বাড়ে ঠিকই এবং এর জন্য অ্যারোবিক-এর সাথে অল্প অ্যানঅ্যারোবিক ব্যায়ামও করা উচিত। কিন্তু বেশি শারীরিক কাজ করার জন্য আর যে সব মূল ব্যাপার — হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও রক্তনালীর রক্ত সরবরাহ করার ক্ষমতা ও রক্ত থেকে পেশির অক্সিজেন আহরণের ক্ষমতা—এ সব বাড়ে অ্যারোবিক ব্যায়ামে।

•••••••••

মধু বা টক দই কখনই ক্যালোরি খরচ করিয়ে দিতে পারে না

•••••••••

শরীরচর্চার প্রেসক্রিপশন:

এটা একজন তিরিশ-চল্লিশ বয়সী এমনিতে সুস্থ মানুষের জন্য, তবে জটিলতাহীন ডায়াবেটিস রোগী বা মোটামুটি মাত্রার উচ্চ-রক্তচাপ রোগী এই 'প্রেসক্রিপশন' মানতে পারেন, তবে তাঁর চিকিৎসকের সঙ্গে একবার কথা বলে নেওয়াই ভাল।

সারাদিনে কমপক্ষে এক ঘণ্টা বরাদ্দ রাখুন শরীরচর্চার জন্য। সকাল বা বিকেলে হলে ভাল, নইলে অন্য সময়, শুধু চড়চড়ে গরমে বাইরে ব্যায়াম চলবে না।

প্রথমে প্রস্তুতি হিসেবে মিনিট-পাঁচেক খালি হাতের হালকা ব্যায়াম বা অল্পমাত্রার দৌড়ঝাঁপ করে পেশিগুলোকে প্রস্তুত করুন। তা হলে পরে ভারী ব্যায়ামের সময়ে পেশিতে টান ধরা ইত্যাদি হবে না। প্রস্তুতি ব্যায়ামের ফলে আপনার অল্প ঘাম হবে আর নাড়ির গতি বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে প্রতি মিনিটে ৯০-১০০, আর জোরে জোরে শ্বাস পড়বে।

তারপর মূল ব্যায়াম হিসেবে এগুলোর যে কোনও একটা। জোরে হাঁটা (ঘণ্টায় ৪-৬ কিমি বেগে), সাঁতার, স্কিপিং বা লাফদড়ি (দড়ি ছাড়া লাফানোও হতে পারে),জগিং, গানের সাথে বা এমনি এমনি নাচা, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ফুটবল, স্কোয়াশ ইত্যাদি খেলা।

মূল অ্যারোবিক ব্যায়ামের তীব্রতা এমন হবে, যে শরীরের শক্তি-উৎপাদন 'অ্যানঅ্যারোবিক মাত্রাসীমা'-র কাছাকাছি থাকে। অন্য ভাষায় বললে, ব্যায়ামকারীর অক্সিজেন ব্যবহারের উর্ধ্বসীমার তথা 'ভি-টু ম্যাক্স'-এর শতকরা ৭০ ভাগ অক্সিজেন ব্যবহার করা হবে এই মাত্রার ব্যায়ামে। এইভাবে ব্যায়াম চলাকালীন নাড়ির গতি কত হবে তার একটা হিসাব আছে। হিসাবের ডিটেলটা আলাদা বক্স করে দেওয়া আছে, এখানে একটা উদাহরণ দিই। আপনার বয়স পঞ্চাশ বছর ও বিশ্রামরত অবস্থায় নাড়ির গতি প্রতি মিনিটে ৬২ হলে, অ্যারোবিক ব্যায়ামের সময়ে আপনার নাড়ির গতি ১২৭ থেকে ১৫৫ (প্রতি মিনিটে) হওয়া উচিত। ব্যায়াম করাকালীন নাড়ির গতি তথা হৃদস্পন্দন-হার মাপার বৈদ্যুতিন যন্ত্রও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

(ক) = সর্বোচ্চ অক্সিজেন ব্যবহারের সময়ে প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দন হার = ২২০ - বয়স (মহিলাদের ক্ষেত্রে ২২৬ - বয়স)
(খ) = বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দন-হার।
(গ) = হৃদস্পন্দন-হার যতটা বৃদ্ধি করা যায় = [(ক) - (খ)]
(ঘ) = অ্যারোবিক ব্যায়ামের সময়ে প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দন-হার অন্তত যতটা হবে = [(খ) + {(গ) x ৬০/১০০}]
(ঙ) = অ্যারোবিক ব্যায়ামের সময়ে প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দন-হার সর্বাধিক যতটা হবে = [(খ) + {(গ) x ৮৫/১০০}]
অ্যারোবিক ব্যায়ামের সময়ে প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দন-হার (ঘ) থেকে (ঙ) -এর মধ্যে থাকবে।

কঠিন লাগছে? তা হলে একদম সহজ হিসাবটা বলেই দিই। ব্যায়ামের যে তীব্রতায় আপনি গান গাইতে পারবেন না, কষ্ট করে কথা বলতে পারবেন, সেটাই হল আপনার জন্য সঠিক তীব্রতা।

মূল অ্যারোবিক ব্যায়ামের সময়কাল হবে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা। এর চাইতে কম করলে লাভও কম পাবেন। আবার এক ঘণ্টার চেয়ে বেশি করলে আনুপাতিক হারে সুফল বাড়ে না, উপরন্তু চোট-আঘাতের সম্ভাবনা বাড়ে।

প্রাণায়াম :

এবার শুরুর কথায় আসি। প্রাণায়াম করার জন্যই কেউ মোটা বা 'আনফিট' হয়ে যান না, কিন্তু প্রাণায়াম করতে গিয়ে যদি অ্যারোবিক ব্যায়ামের সময়ে টান পরে তাহলেই মুশকিল। অ্যারোবিক ব্যায়ামের সুফল থেকে বঞ্চিত হবার ফলে তাঁর সমস্যা শুরু হয়। কিন্তু প্রাণায়ামের কি কোনও সুফল নেই? না থাকলে সেটা এত মানুষ করে চলেছেন কেন? নাকি প্রাণায়ামকে গালি-পাড়া আমাদের আধা খ্যাঁচড়া জ্ঞানের বদহজম-উদগার মাত্র? দেখা যাক। এবং বিজ্ঞাপন-বিরতি না থাকলেও বলি, পাঠক, এবার সঙ্গে থাকুন। ভারী কঠিন প্রশ্নের সহজ জবাব পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক ডাক্তারি জার্নালে দেখানো হয়েছে, ১০০ জন ডায়াবেটিস রোগী দৈনিক এক ঘণ্টা করে যোগাসন (Body postures), প্রাণায়াম (Breathing exercise) ও ধ্যান (Meditation) করার ফলে

তাঁদের ওজন কমেনি বটে, কিন্তু মোট কোলেস্টেরল, লঘু ঘনত্বের (অর্থাৎ ক্ষতিকর) কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসেরাইড কমেছে (Indian Heart Journal, Vol.65, No.2, March-April 2013, p 127-136)। পরিসংখ্যান-শাস্ত্র তথা স্ট্যাটিসটিকসের কিছু নিয়ম মেনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্ত পরীক্ষা করতে হয়, কেননা প্রত্যেক রোগীর সমান ভাল ফল কোনও চিকিৎসায় হয় না, আর চিকিৎসা ছাড়া একজন নির্দিষ্ট রোগীর অবস্থার কতটা উন্নতি বা অবনতি ঘটত সেটা বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর রোগীর সংখ্যা বড্ড কম, মাত্র ১০০। পরিসংখ্যানশাস্ত্র মতে, তাঁদের যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে তা থেকে এইটুকুই বলা যায় যে পরীক্ষার ফল আশাব্যঞ্জক, কিন্তু সুনিশ্চিত করে বলা যায় না যোগ, প্রাণায়াম ও ধ্যান শরীরের পক্ষে উপকারী। উপকারী হলে কতটা উপকারী সেটা বলার প্রশ্নই নেই। যে গবেষকরা পরীক্ষাটি করেছেন তাঁরাও শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, এবং বলেছেন— এই নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। এই ধরনের বহু ব্যাপারে দেখা গেছে, কম সংখ্যক রোগীকে নিয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়া গেলেও পরে বড় পরীক্ষায় কোনও ভাল ফল পাওয়া যায় না, আবার হয়তো বা অনেক বেশি ভাল ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু যোগ, প্রাণায়াম বা ধ্যান নিয়ে চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা নিজেরা এরকম পরীক্ষা আদৌ করেন না। অন্যদের পরীক্ষার ফল বিপক্ষে গেলে তা উড়িয়ে দেন, আর সামান্য স্বপক্ষে গেলেই সেটাকেই ‘একতম সত্য’ এমন প্রচার করেন। দু’টো ব্যাপার আছে। প্রথমত, যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যান—এগুলোর সঙ্গে যে ভাবেই হোক ধর্মীয় অনুষঙ্গ জড়িয়ে গেছে। ধর্ম মানুষকে যতটা মেনে নিতে বলে, যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে ততটা বলে না। ফলে যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যান---এদের চর্চাটা বিজ্ঞানচর্চার মতো করে করার ঐতিহ্যটাই গড়ে ওঠেনি। এবং দেশে-বিদেশে যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যান এখন পণ্য। অনেকে এর বাজারে বেশ সফল ব্যবসায়ী, খ্যাতি-অর্থ দুটোই পেয়েছেন। ফলে এগুলো নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে তাঁরা আগ্রহী নন, অন্যরা বিশ্লেষণ করে ভাল কথা বললে সেটা তাঁরা প্রচার করেন, অথচ উল্টোটা হলেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন। আর নিজেরা প্রচার চালান ‘প্রাণশক্তি’, ‘আত্মিক উন্নতি’ এই সব কথা বলে। এগুলো কী, আর কেমন করে এগুলোর উন্নতি মাপব, সে কথা উহ্যই থাকে। আবার স্থানে-অস্থানে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অপব্যবহার করে তাঁরা এমন পরিমণ্ডল রচনা করেন যে সাধারণ মানুষের মনে হয় তাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই অনুসরণ করছেন। একে বলে ‘ছদ্ম-বিজ্ঞান’। অনেকে রীতিমত ওষুধ প্রেসক্রিপশন, এমনকী ওষুধ বিক্রির বিশাল কারবারও বানিয়েছেন। অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে কোনও কিছুর ‘ওষুধ’ শিরোপা পেতে গেলে যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আসতে হয় তাঁরা সেগুলো কখনও করেন না।

যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যান নিয়ে কেউ কেউ ব্যবসা করছেন বলেই সেটাকে পুরো বাতিল করার কোনও মানে নেই। যথাযথ শরীরচর্চা করে যদি সময় ও ইচ্ছা থাকে তো যোগব্যায়াম (আসন) প্রাণায়াম, ধ্যান করা যেতে পারে। পাথুরে প্রমাণ নেই, কিন্তু যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে এগুলো করলে শরীরের অস্থিসন্ধি সচল থাকে ও অ্যারোবিক ব্যায়ামের পর ক্লান্তি খানিক দূর হয় ও মানসিক প্রশান্তি আসে—একথাগুলো একেবারে অযৌক্তিক নয়। কিন্তু আবার বলি, এ নিয়ে আরও বৈজ্ঞানিক চর্চা দরকার, আর সে চর্চাটা খোলা মনে করতে হবে।

অ্যারোবিক ব্যায়াম সম্পর্কে কয়েকটি সতর্কতা। এক জোড়া ভাল জুতোর কোনও বিকল্প নেই, নইলে পায়ে ব্যথা হবে, গাঁটে স্থায়ী ক্ষতি হওয়াও আশ্চর্য নয়। গাঁটে ব্যথা থাকলে, বিশেষ করে হাঁটুতে ব্যথা থাকলে, হাঁটা চলবে না, দৌড়ঝাঁপ চলবে না। সাঁতারই সেরা উপায়। সাঁতার না জানা থাকলে কোমরজলে এক নাগাড়ে হাঁটা চলতে পারে। ব্যায়ামের সময় প্রচুর জল শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, সুতরাং আগেই অনেকটা জল খেয়ে অ্যারোবিক শুরু করা ভাল।

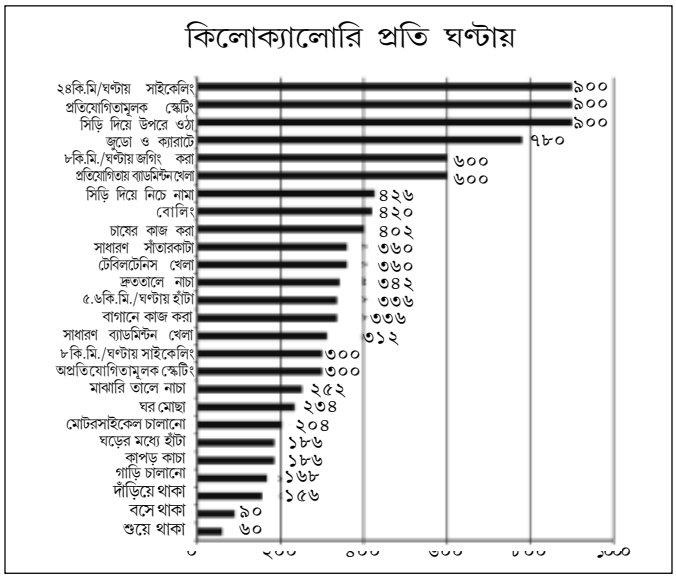

কোন ব্যায়ামে কত ক্যালোরি খরচ

লেখক পরিচিতি : ডা. গৌতম মিস্ত্রি, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম (কার্ডিওলজি), হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

‘অস্টিওপোরেসিস’

বেশি বয়সে ‘উঃ, আঃ, আউচ্’, অল্প চোটে হাড়ভাঙা, আর কুঁজো হয়ে যাওয়া—এসবগুলোর পেছনে ভিলেন একটাই। হাড়গুলো সব ঝুরঝুরে কমজোরি হয়ে যায়, যেন ঘুণপোকা ধরা কাঠ! এরোগের নাম অস্টিওপোরেসিস। তারই বৃত্তান্ত—লিখছেন **ডা. রূপনারায়ণ ভট্টাচার্য্য**।

প্র: অস্টিওপোরেসিস কি?

উ: অস্টিওপোরেসিস কথাটি এসেছে Porous bone-শব্দগুলো থেকে। এতে হাড় ক্রমশ পাতলা ও ভঙ্গুর হয়ে আসে এবং সহজেই তা ভেঙে যায়। বিভিন্ন কারণে হাড়ে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দেখা দিলে হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। যদিও শরীরের যে কোনও হাড়েই এটি হতে পারে— বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল কোমরের হাড় (Hip joint), মেরুদণ্ড এবং কব্জীর হাড় (wrist joint)

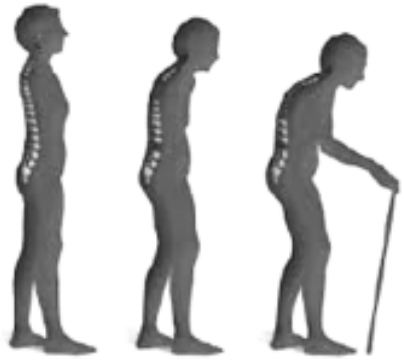

প্র: অস্টিওপোরেসিস হওয়ার সম্ভাবনা কাদের বেশি?

উ: হরমোনের কারণে মহিলাদের এটি বেশি হয়, যদিও পুরুষরা একটু বেশি বয়সে এতে ভোগেন।

অন্যান্য কারণগুলো হল—সুষম খাদ্য না খাওয়া (ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ‘ডি’-এর ঘাটতি), শরীরে সূর্যালোক না লাগা (গৃহবন্দি হয়ে থাকা), কিছু বিশেষ বিশেষ ওষুধ খাওয়া, কায়িক শ্রম না করা, মদ্যপান এবং ধূমপান করা, অতি রুগ্নতা অথবা অতি স্থূলতা।

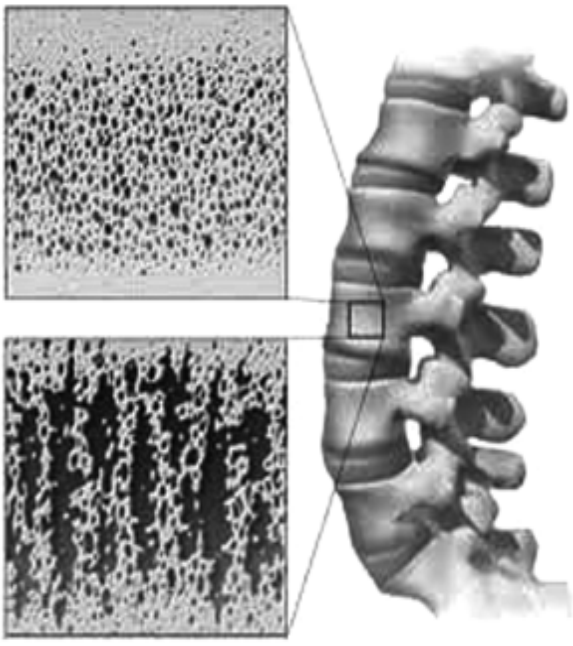

প্র: ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি - এদের কি ভূমিকা ?

উ: অস্থির প্রধান খনিজ পদার্থ ক্যালসিয়াম। এই ক্যালসিয়াম অস্থির গঠনের এবং দৃঢ়তা রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্যালসিয়াম খাদ্যের সাথে অথবা ওষুধের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়। খাদ্যনালী থেকে ক্যালসিয়াম শোষিত হয়ে রক্তবাহিত হয়ে অস্থিতে পৌঁছায় ও অস্থি গঠনে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের রক্ত থেকে অস্থিতে প্রবেশ এবং অস্থি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়ামের রক্তে নির্গমন—এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করে ভিটামিন ‘ডি’। ভিটামিন ডি খাদ্যের মাধ্যমে আসে; তা ছাড়া সূর্যালোকের সাহায্যে ত্বকে তৈরী হয়।

প্র: অস্টিওপোরেসিস কি কি কারণে হয়?

উঃ (১) বংশগত / পারিবারিক কারণ।
(২) বয়সজনিত (মহিলাদের ৪৮-৫০ বছর এবং পুরুষদের ৬৫ বছর ও তার পরে)।
(৩) মহিলাদের রজোনিবৃত্তি।
(৪) অলস জীবনযাত্রা বা কায়িক শ্রমের অভাব।
(৫) তামাকের ব্যবহার।
(৬) নিয়মিত মদ্যপান।
(৭) স্তনের ক্যানসার।
(৮) বিভিন্ন ওষুধের ব্যবহার।

প্র: কি কি অসুখে বা ওষুধ খেলে এর সম্ভাবনা বাড়ে?

উ: (১) হাঁপানি বা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসায় স্টেরয়েড গ্রহণ করা।
(২) দীর্ঘদিন রোগে ভোগা।
(৩) থাইরয়েডের সমস্যা।
(৪) খাদ্যনালীর সমস্যা।

প্র: অস্টিওপোরেসিস-এর লক্ষণ কি?

উ: (১) শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা (বিশেষত পিঠে, কোমরে, হাঁটুতে)।
(২) ক্রমশ কুঁজো হয়ে উচ্চতা হ্রাস পাওয়া
(৩) সামান্য আঘাতে অথবা আঘাত ছাড়াই হাড় ভেঙে যাওয়া।

প্র: রোগ নির্ণয় করা হয় কিভাবে?

উ: (১) এক্সরে করে বোঝা যায়—যদিও বুঝতে বুঝতে ৩০-৪০ শতাংশ ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব কমে যায়।

(২) বোন ডেনসিটোমেট্রি পরীক্ষা করে প্রাথমিক অবস্থাতেই এটি বোঝা যায়।

প্র: অস্টিওপোরেসিস কি ভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে?

উ: (১) সুষম খাদ্য গ্রহণ করা (পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম যুক্ত খাদ্য) এবং অপুষ্টি এড়ানো।

(২) পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি-এর গ্রহণ সুনিশ্চিত করা ও পর্যাপ্ত সূর্যালোক শরীরে নেওয়া।

(৩) সক্রিয় জীবনযাপন করা ও নিয়মিত ব্যায়াম করা।

(৪) ধূমপান ও মদ্যপান এড়ানো।

বিভিন্ন খাদ্য, বিশেষত সয়াবিন এই ব্যাপারে খুবই উপযোগী, সয়াবিনের বিভিন্ন রকম খাদ্য নিজের খাদ্য তালিকায় যোগ করলে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়, বিভিন্ন রকম ফল ও সব্জী এই বিষয়ে উপকারী।

সাধারণ হাড়

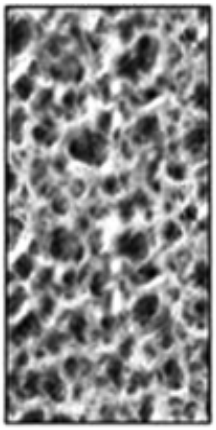

অস্টিওপোরেসিস

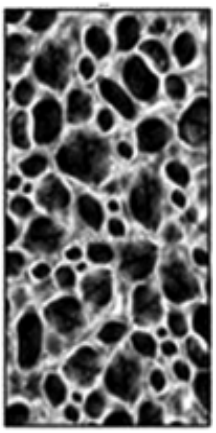

প্র: কোন কোন খাদ্যে ক্যালসিয়াম বেশি থাকে?

উ: (১) দুগ্ধজাতীয় খাবার (দুধ, দই, চিজ, ছানা)

২) সয়াবিন, সয়াবিনের বিভিন্ন খাদ্য।

(৩) বিভিন্ন শুকনো ফল (আখরোট, কাজু, খেজুর), শুকনো মাছ।

(৪) আতা, কুমড়ো, ছোলার ডাল, মটর।

প্র: অস্টিওপোরেসিস-এর চিকিৎসা কি?

উ: এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য ৪টি

(১) প্রতিরোধ করা— ইতিপূর্বে তা আলোচনা করা হয়েছে।

(২) ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা

(৩) ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা

(৪) অস্টিওপোরেসিস জনিত যে জটিলতা (complication)-তার চিকিৎসা।

ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা—এটি একান্তভাবেই চিকিৎসকের বিবেচনাধীন নিম্নলিখিত ওষুধগুলো দেওয়া হয়।

(১) ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন কে২ সম্পূরক (২) বিসফসফোনেট (৩) ক্যালসিটোনিন।

ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা

১। সঠিক শারীরিক ভঙ্গিমা বজায় রাখা—বেশি সামনে ঝোঁকা কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো বা বসা, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বসা বা শোয়া — ইত্যাদি বারণ।

২। পড়ে যাওয়া প্রতিরোধ করা—

মেঝে পরিষ্কার রাখা, বাথরুম পরিষ্কার রাখা, — যাতে মেঝে পিচ্ছিল না থাকে, ঘরদোর আলোকিত করা, হিলতোলা জুতো না পরা, বিভিন্ন স্থানে সাপোর্ট বা রেলিং লাগানো।

৩। নিয়মিত ব্যায়াম করা, হাঁটা, সূর্যের আলো গায়ে লাগানো।

উপসংহার : অস্টিওপোরেসিস সম্পূর্ণ রূপে এড়ানো যায় না। অতিমাত্রায় অস্টিওপোরেসিস থাকা সমস্ত ব্যক্তির জীবনে এবং কাজকর্মে এটি প্রভাব ফেলে, কিন্তু এই সমস্যাকে অতিক্রম করে ও এটির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা যায়। কিছু নিয়ম মেনে চললে, যেমন সুষম খাদ্য খাওয়া, ব্যায়াম করা, প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করা—এই সমস্যাকে অতিক্রম করে বা সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলা যায়।

লেখক পরিচিতি : ডা. রূপনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ, একটি সরকারি মেডিকাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত

With Best Compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029

Phone : 033 2486-7885 / 8087

Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029

‘মাথা ঘোরা’: কী, কেন হয় এবং কী করবেন

অতি সামান্য কারণে যেমন মাথা ঘুরতে পারে, তেমনই কিছু গুরতর অসুখের লক্ষণ হিসেবেও মাথা ঘোরা দেখা দিতে পারে। মাথা ঘোরার কারণ নির্ণয় করা সবসময়ে সোজা নয়, অনেক বড় বড় ডাক্তারবাবুও মাঝে মধ্যে এই লক্ষণের সঠিক ব্যাখ্যা করতে হিমসিম খান। সুতরাং এবিষয়ে লেখা নেহাত সহজ হবে না, এই নিবন্ধ পড়ে পাঠকের মাথা ঘুরলে সহজ দাওয়াই লেখার শেষটা দেখে নেওয়া—লিখছেন **ডা. সুশীল সিট**।

সাধারণ ব্যক্তি হঠাৎ করে সেলিব্রিটি হয়ে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল। এটা কি সেই ‘মাথা ঘোরা?’ না। মোটেও না। মাথা ঘোরা একটা অত্যন্ত পরিচিত উপসর্গ। প্রায় প্রতিটি মানুষই কোনও না কোনও সময়ে এটা অনুভব করেছেন। তবে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অনুভূতিকে মাথা ঘোরা বলে বর্ণনা করেন। যেমন, কেউ বলেন— ‘মনে হচ্ছে যেন টলে পড়ে যাচ্ছি’, কেউবা বলেন, ‘মাথাটা কেমন যেন হাল্কা হাল্কা লাগছে’, আবার কেউ বলেন, ‘মাথাটা ঝিমঝিম করছে এবং চোখে অন্ধকার দেখছি’— এসবই মাথা ঘোরা, ডাক্তারি পরিভাষায় এগুলোকে বলে ‘ডিজিনেস’ (Dizziness) আরও এক ধরনের মাথা ঘোরা আছে, তার নাম ভার্টিগো (vertigo), এতে রোগীর অনুভূতি হয় যেন সে নিজেই ঘুরছে বা নড়ছে এবং তার চারপাশ স্থির আছে, অথবা, সে নিজে স্থির আছে কিন্তু তার চারপাশ ঘুরছে বা নড়ছে।

মাথা ঘোরা কেন হয় তা জানতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে আমাদের শরীরের ‘ব্যালান্স’ বা ভারসাম্য কিভাবে রক্ষিত হয়। ভারসাম্য রক্ষার কাজটি আসলে শরীরের অনেকগুলি অঙ্গের মিলিত প্রয়াস। আমাদের দৃষ্টিশক্তি (Vision), অন্তকর্ণের ভিতরে অবস্থিত ভারসাম্যযন্ত্র (Vestibular apparatus), বিভিন্ন পেশী ও অস্থিসন্ধি থেকে নির্গত অন্তর্মুখী সিগন্যাল (proprioceptive sensation), সেরিবেলাম এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কিছু সংযোগকারী অংশ ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা একটা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া এবং উল্লিখিত প্রতিটি অঙ্গ একে অপরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। এই সামঞ্জস্য যখন বিঘ্নিত হয়, তখনই দেখা দেয় ‘মাথা ঘোরা’। ভারসাম্যরক্ষাকারী বিভিন্ন অঙ্গগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক, কোনও একটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যান্য অঙ্গগুলি ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ভারসাম্য রক্ষার কাজটা অনেকটাই পরিপূরণ করে। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে মাথা ঘোরা যত তীব্র থাকে, পরে পরে তা অনেকটাই কমে যায়।

এখন দেখে নেওয়া যাক্, মাথা ঘোরার কারণগুলো কী কী হতে পারে।

১। দৃষ্টিশক্তি (vision) সংক্রান্ত সমস্যা — শরীরের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে চোখের দৃষ্টিশক্তির একটা বিরাট ভূমিকা আছে। সেজন্য, দৃষ্টি শক্তির সমস্যা, যথা, ‘মায়োপিয়া’, ‘হাইপার মেট্রোপিয়া’ এবং ‘অ্যাসটিগমাটিস্‌ম্‌’ থাকলে, কিংবা চোখের পেশীর অত্যধিক দুর্বলতা থাকলে মাথা ঘুরতে পারে।

২। ‘মিনিয়ার্স ডিজিজ’—এই রোগের প্রকৃত কারণ জানা যায় নি। অন্তঃকর্ণের ভিতরে আবরণী বেষ্টিত থলিতে ‘এন্ডালিম্ফ’ নামে এক প্রকার তরল পদার্থ থাকে। এই রোগে ‘এন্ডোলিম্ফ’ অধিক পরিমাণে তৈরি হয়, ফলে ভিতরে চাপ বাড়তে থাকে। ফলে, অন্তকর্ণের ভিতরে ‘কক্‌লিয়া’ এবং ‘ভেস্টিবুলার অর্গান’-এর সংবেদনশীল কোষগুলো নষ্ট হতে থাকে। ফলশ্রুতি—মাথাঘোরা, কানে কম শোনা, কানে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ, বমিভাব এবং কানে ভারি ভারি লাগা এইসব হতে থাকে। এই রোগ কিছুদিন পরপর ঘুরে ফিরে আসতে পারে।

৩। ‘বিনাইন প্যারোক্সিস্‌মাল পোজিশনাল ভার্টিগো’ (BPPV) এই রোগে মাথাকে একটি নির্দিষ্ট সংকট অবস্থানে নিয়ে গেলে মাথা ঘোরা শুরু হয়। অবস্থান পরিবর্তন করলে মাথা ঘোরা কমে যায়। এতে কানে কম শোনা বা অন্যান্য উপসর্গ থাকে না।

৪। ‘ভেস্টিবুলার নিউরোনাইটিস’—এই রোগে ‘ভেস্টিবুলার গ্যাংলিয়ন’ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। হঠাৎ করে তীব্র মাথাঘোরা শুরু হয় এবং কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আপনিই সেরে যায়।

৫। ‘ল্যাবিরিন্‌থাইটিস্‌’—অন্তঃকর্ণের সংক্রমণ। এই সংক্রমণ ভাইরাস অথবা ব্যাক্‌টেরিয়া দ্বারা হতে পারে। অনেক সময় কোনও সংক্রমণ ছাড়াই কেবলমাত্র প্রদাহের জন্য হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কানের পর্দাফুটো এবং কানে পূঁজ পড়া রোগের জটিলতা হিসাবে ল্যাবিরিন্‌থাইটিস হতে পারে।

৬। কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে— ‘স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন,’ ‘জেন্টামাইসিন,’ ‘ক্যানামাইসিন’ ইত্যাদি ‘অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড’ জাতীয় ওষুধ অন্তঃকর্ণের সংবেদনশীল কোষগুলোকে (Haircell) নষ্ট করে দেয়। ফলে, মাথাঘোরা এবং কানে কমশোনা জাতীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৭। আঘাতজনিত কারণ—মাথায় জোরে আঘাত লাগলে অন্তঃকর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অনেক সময় প্রচন্ড জোরে শব্দ, যেমন বিস্ফোরণের শব্দ, ভারসাম্য যন্ত্রের ক্ষতিসাধন করতে পারে।

৮। ‘পেরিলিম্ফ ফিস্‌চুলা’— অন্তঃকর্ণের ভিতরে একেবারে অন্তপুরে যে তরল পদার্থ থাকে তাকে বলে ‘এন্ডালিম্ফ’ এবং বাহিরমহলে যে তরল পদার্থ থাকে তাকে বলে ‘পেরিলিম্ফ’। একটি গোল এবং একটি ডিম্বাকৃতি জানালার মাধ্যমে মধ্য কর্ণের সঙ্গে এর যোগাযোগ। যদি কোনও কারণে এই জানালায় ছিদ্র হয়ে যায় তাহলে ‘পেরিলিম্ফ’ অন্তঃকর্ণ থেকে বার হয়ে মধ্যকর্ণে পৌঁছায়। তাতে অন্তঃকর্ণের ক্ষতি হয়। ফল মাথা ঘোরা।

৯। 'সিফিলিস', বিশেষত 'নিউরোসিফিলিস্' থাকলে ভারসাম্য যন্ত্র এবং তার সংযোগকারী স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মাথা ঘোরা হতে পারে।

১০। ৮ নং ক্রেনিয়াল নার্ভ (Vestibulo-cochlear nerve)-এ একরকম টিউমার হয়। এর নাম 'অ্যাকাউস্টিক নিউরোমা' (acoustic neuroma) মাথা ঘোরা এই রোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১১। 'ভার্টিব্রোবেসিলার ইনসাফিসিয়েন্সি' (vertebrobasilar insufficiency)— ভার্টিব্রোবেসিলার রক্তনালীসমূহের মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ হয়। রক্তনালীতে কোলেস্টেরল জমলে, অথবা ঘাড়ের শিড়দাঁড়ায় 'স্পন্ডাইলোসিস' হলে, কিংবা কোনও কারণে শরীরের রক্তচাপ কমে গেলে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কম হতে পারে। ফলশ্রুতি—মাথা ঘোরা।

১২। 'ওয়ালেনবার্গ সিনড্রোম'— 'পস্টিরিয়র ইনফিরিয়র' সেরিবেলার ধমনীর রক্ত জমাট বেঁধে গেলে মস্তিষ্কের 'ল্যাটারাল মেডালারি' অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ কম হয়ে যায়। এই অঞ্চলে ভারসাম্য রক্ষাকারী এবং সংযোগকারী স্নায়ুতন্ত্রগুলো অবস্থিত। ফলে, প্রবল মাথাঘোরা, বমি এবং অন্যান্য স্নায়ুর সমস্যা দেখা দেয়।

১৩। 'বেসিলার মাইগ্রেন'— 'মাইগ্রেন' বা আধকপালি রোগে বিশেষ অঞ্চলের রক্তনালী প্রথমে সংকুচিত, এবং পরে স্ফীত হয়। রক্তনালীর পার্শ্ববর্তী নার্ভটিস্যু উত্তেজিত হয়। বেসিলার ধমনীর মাইগ্রেনে মাথার পিছন দিকে যন্ত্রণা হয়, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা হয় এবং হঠাৎ করে মাথা ঘোরা শুরু হয়। সচরাচর কমবয়সী মহিলাদের এই রোগ বেশী হয়।

১৪। সেরিবেলামের অসুখ — মস্তিষ্কের একটা অংশ হল সেরিবেলাম। ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গগুলির মধ্যে সেরিবেলাম অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। সেরিবেলামে কোনও সংক্রমণ, রক্তক্ষরণ অথবা টিউমার হলে মাথাঘোরা, বমি এবং শরীরের বিভিন্ন পেশীর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দেয়।

১৫। 'মাল্টিপ্‌ল্ স্ক্লেরোসিস্'— সাধারণত কমবয়সীদের মধ্যে দেখা যায়। স্নায়ুতন্ত্রের 'মায়েলিন' নামক আবরণী নষ্ট হয়ে যায়। মাথাঘোরা এই রোগের প্রধান উপসর্গ। এছাড়া দৃষ্টি শক্তির সমস্যা এবং অনুভূতির সমস্যাও দেখা যায়।

১৬। মস্তিষ্কের 'পন্‌স্' এবং 'মিড্‌ব্রেন' অঞ্চলে টিউমার হলে ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গের সংযোগকারী স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মাথা ঘোরা, বমি এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়।

১৭। মৃগীরোগ—বিশেষত 'টেম্পোরাল লোব্ এপিলেপ্সি' তে মাথা ঘোরা অন্যতম প্রধান উপসর্গ।

১৮। শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্যের অভাব — মানবদেহের সমস্ত কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্য ঠিক থাকা প্রয়োজন, শরীরের রক্তচাপ, অক্সিজেনের সম্পৃক্তি, জল এবং সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং অন্যান্য লবনের পরিমাণ, রক্তের অম্লতা (pH) ইত্যাদির ওপর শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্য (Homeostasis) নির্ভর করে। এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হলেও মাথা ঘোরা হতে পারে। এছাড়া রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খুব কমে গেলে মাথা ঘুরতে পারে।

১৯। মানসিক ভারসাম্যের অভাব—অনেক সময় অতিরিক্ত আবেগ প্রবণতা, দুশ্চিন্তা এবং টেনশনের ফলে মাথাঘোরা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মাথা ঘোরার অসংখ্য কারণ হতে পারে। তাই মাথার সমস্যা নিয়ে আসা রোগীর রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেকগুলো বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন।

মাথা ঘুরলে কী করবেন?

হঠাৎ মাথাঘোরা শুরু হলে চেষ্টা করুন কোনও নিরাপদ স্থানে বসে পড়তে। অন্যের সাহায্য পেলে ভাল, না পেলে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। যদি ডায়াবেটিসের রোগী হন এবং অ্যান্টিডায়াবেটিক ওষুধ খান তা হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা মাথায় রাখবেন এবং প্রয়োজন হলে গ্লুকোজ বা চিনি খেয়ে নিতে পারেন। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পরিশেষে, একটা কথা বলা প্রয়োজন যে মাথাঘোরা এক সাধারণ পরিচিত উপসর্গ। সামান্য কারণের জন্যও যেমন এটা হতে পারে তেমনি কিছু গুরুতর অসুখেরও এটা একটা উপসর্গ। তাই একে যেমন অবহেলা করাও উচিত নয়, তেমনই আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ারও কোনও প্রয়োজন নেই।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুশীল সিট, এমবিবিএস, ডি এল ও, এম ডি, একজন নাক-কান-গলার রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

ADVERTISEMENT

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

মাথাঘোরার কম-জানা কিছু কথা

''ভার্টিগো'' অর্থাৎ মাথাঘোরা নিয়ে স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় আগষ্ট - সেপ্টেম্বর ২০১৩ সংখ্যার পর আবার এই সংখ্যায় প্রায় পরপর দুটো লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম লেখাটি ছিল ডা. পার্থপ্রতিম পালের, আর এবারের সংখ্যায় ডা. সুশীল কুমার শীটের। লেখা দু'টি পড়ে আমাদের কয়েকজনের মনে হয়েছে তথ্যপূর্ণ এই লেখা দু'টি পাঠকের পক্ষে একটু ভারী হয়ে গেল, আর দু'একটা প্রাসঙ্গিক জিনিস বাদ পড়ে গেল। তাই এই সংযোজনটি — লিখেছেন **ডা. সীতেশ দাশগুপ্ত ও ডা. আশীষ কুমার কুণ্ডু।**

মাথা ঘুরতেই সাধারণত লোকেরা ধরে নেয় ঘাড়ে স্পনডাইলোসিস হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তারবাবুরা তাদের তাই বলে এসেছেন। অনেক ডাক্তারবাবু এখনও তাই মনে করেন। তাই তাঁরা রোগীদের ঘাড়ের এক্সরে করাতে বলেন। অবধারিত ভাবে এক্সরেতে স্পনডাইলোসিসের কিছু চিহ্ন দেখা দেয়। তখন ডাক্তারবাবুরা স্পনডাইলোসিসের ব্যায়াম করতে বলেন। কিন্তু সঙ্গে যে ওষুধগুলো দেন সেগুলো অন্তকর্ণে কাজ করে (Vestibular Suppresor)। একটা বৈপরীত্য থেকে গেল না কী? স্পনডাইলোসিসে কি সত্যিই মাথা ঘোরে?

সম্ভাবনা খুব কম। দু'টো তত্ত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এক, গলার জায়গায় মেরুদণ্ডের হাড়গুলোর অংশবিশেষে (cervical spine এর facet-এ) কিছু অবস্থান-বোঝার মতো স্নায়ুযন্ত্র (position receptors) থাকে। বলা হয় স্পনডাইলোসিস-এ গলার অবস্থান বোঝার স্নায়ুযন্ত্রের কাজে ব্যাঘাত হবার ফলে গলা বা ঘাড়ের নাড়াচাড়াতে মাথা ঘুরতে পারে। দুই, কোনওভাবে স্পনডাইলোসিসজনিত কশেরুকার ক্ষুদ্র উঁচু অংশ (spondylotic spur) যদি ভার্টিব্রার ধমনীতে চাপ দেয় তাহলে মাথা ঘুরতে পারে। তবে এসব সম্ভাবনা বেশ কম, তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে স্পনডাইলোসিস-এ মাথা ঘোরা হয় না বললেই চলে।

মাথা ঘোরা মানে ঠিক কী?

যখন কোনও রোগী মাথা ঘোরার উপসর্গের কথা বলেন তখন ডাক্তারের প্রথম কাজ এটা বোঝা যে রোগী মাথা ঘোরা বলতে চাইছেন না কী টলমল ভাব বলছেন না কি চোখে অন্ধকার দেখার কথা বলছেন। এই তফাতটা করা দরকার, কেন না এগুলোর কারণগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা।

মাথা ঘোরা মানে হচ্ছে যেখানে নড়াচড়া নেই সেখানে নাড়াচড়ার অনুভূতি ''a false sense of motion''— চারপাশটা ঘুরছে, মনে হচ্ছে ঘুরছে—সত্যিকারের নয়। কখনও বমিভাব অথবা বমি হতেও পারে। মিনিয়ারস ডিজিজ (Menier's Disease)-এ কখনও কখনও রোগী মাটিতে পড়েও যায়।

কেন মাথা ঘোরে?

মাথা ঘোরা কেন হয় তা 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' প্রকাশিত উপরোক্ত লেখা দুটোয় বিস্তারিত ভাবে আছে। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে ব্যাপারটা এই রকম।

পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আমাদের অবস্থান আমরা বুঝতে পারি (আমাদের অজ্ঞাতসারেই) আমাদের কিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে। ভিসুয়াল (দৃষ্টি), ভেস্টিবুলার (অন্তঃকর্ণ) আর ''propioceptive system'' একটা স্নায়বিক ব্যবস্থা যেটা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য মস্তিষ্কে পাঠায়—আমাদের শরীরের সামগ্রিক অবস্থান, নানা অংশের অবস্থান এবং শরীরের গতি বা চলাফেরা সম্পর্কে আমাদের মস্তিষ্ককে (বিশেষ করে সেরেবেলাম, ব্যাসাল গ্যাংলিয়া ও পিরামিডাল ফাইবারকে) জানান দেয়। মস্তিষ্ক আমাদের শরীরকে চালিত করে যাতে আমরা পড়ে না যাই। এই সূক্ষ্মতুলাদণ্ডে যদি ভারসাম্যের গণ্ডগোল থাকে তা হলে শরীরে অনেক সমস্যা দেখা দেয়।

মনে রাখতে হবে যে আমাদের দুটো কান, দুটো চোখ আর মস্তিষ্কে দুটো অর্ধগোলক আছে। এই দুই দিকের স্নায়ুতন্ত্র পার্টনারের ভূমিকা পালন করে। দুজনে দুজনের বিরুদ্ধে কাজ করে না। মুশকিল হচ্ছে একজন পার্টনার যদি কাজ করতে না পারে তা হলে অন্যজন তার কাজ পূরণ করতে পারে না। তখনই মাথা ঘোরার সমস্যা দেখা দেয়।

স্বাভাবিক বা নীরোগ অবস্থাতেও মাথা ঘুরতে পারে। যেমন ছাদ রং করতে গিয়ে (ঘাড় উঁচু করে) অথবা ঘুরন্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকলে।

সুতরাং পরামর্শ হল মাথা ঘোরাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মাথা ঘোরার অনেক জটিল কারণ থাকলেও অধিকাংশ সময়েই মাথা ঘোরা হয় অন্তঃকর্ণের রোগে।

চিকিৎসা : এর চিকিৎসাও সাধারণত সহজ কয়েকদিন Vestibular Suppressor (যা অন্তঃকর্ণের ওপর কাজ করে) খাওয়া। আর অন্তঃকর্ণকে স্বাভাবিক কাজে ফিরিয়ে আনতে 'ভেস্টিবুলার রিহ্যাবিলিটেশন' করা। এর জন্য মাথাঘোরার ব্যায়াম করা দরকার। সে ব্যায়াম মোটেই স্পন্ডাইলোসিসের ব্যায়াম নয়। এই ব্যায়ামগুলোর নাম Cawthorne-Cooksey এক্সারসাইজ, Brandt-Daroff এক্সারসাইজ ইত্যাদি। এছাড়া Epley Maneuver এর কথাতো ডা. পাল লিখেছেন। এই হল সাধারণ মাথাঘোরার সাধারণ কারণ ও চিকিৎসা। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

লেখক পরিচিতি : ডা. সীতেশ দাশগুপ্ত, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, নিউরোলজিস্ট; একটি সরকারি হাসপাতালে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ।
ডা. আশীষ কুমার কুণ্ডু, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, এমডি, ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

একটি অন্য লিঙ্গের গল্প

*২০১২ সালে ভারতের জন্য এশিয়াডে সোনা জিতে আনা মেয়ে পিঙ্কি প্রামাণিকের বিরুদ্ধে তার বান্ধবীর আনা ধর্ষণের অভিযোগ সারা দেশে আলোড়ন ফেলে দিল। অভিযোগকারিণীর দাবী পিঙ্কি আসলে ছেলে। এক জন মেয়ের বিরুদ্ধে আর একজন মেয়ে কী ভাবে আনতে পারে এই অভিযোগ? তবে পিঙ্কির লিঙ্গ পরিচয় কী? সে ছেলে না মেয়ে? না কী সে উভলিঙ্গ? এসব প্রশ্ন মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। আর সংস্কার-অন্ধ ভারতীয়দের যৌনতা সম্বন্ধে চাপা অথচ অপরিসীম কৌতূহলকে কাজে লাগিয়ে রমরম করে ব্যবসা করতে লাগল সংবাদ মাধ্যম ও টিভি চ্যানেলগুলো। আমাদের দেশে যৌনতা সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা অশালীন ও ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়। তাই যৌনতাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মনে আছে কৌতূহল, অজ্ঞতা ও নানা ভুল ধারণা। স্বাভাবিক যৌন আচরণ বলতে আমরা তাকেই বুঝি যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনুসরণ করে। ব্যতিক্রমী কিছু দেখলেই বা শুনলেই তাই নিয়ে শুরু হয় ঘটনা তলিয়ে দেখার নাম করে নোংরামি। পিঙ্কি প্রামাণিকের ঘটনাটা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই মানসিকতা থেকে তখনই বেরিয়ে আসা যাবে যখন যৌনতা ও তার সমস্যাগুলো সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সঠিকভাবে সচেতন করে তোলা যাবে। লিঙ্গ কী? যৌন-পরিচয় (sex identification) ও লিঙ্গ-পরিচয়ের (gender identification) তফাত কী? লিঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যা কী হতে পারে? সেই সমস্যার উৎপত্তি কি ভাবে হয়? এই সব নিয়ে আলোচনা করেছেন—***রুমঝুম ভট্টাচার্য ও ডা. সুমিত দাশ।***

লিঙ্গ-পরিচয় (gender) ও যৌন-পরিচয় (sex) বলতে কী বোঝায়?

শারীরিক গঠন অনুযায়ী একজন মানুষ যদি মেয়ে বা ছেলে হয় তা হলে সেটা হল তার যৌন-পরিচয়। তবে লিঙ্গ-পরিচয় কী? প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত যৌন-পরিচয়ের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিভাষা যুক্ত হয়ে যে পরিচয় নির্মিত হয় তাকে লিঙ্গ-পরিচয় বলা হয়। একজন বাচ্চা যখন জন্মাচ্ছে তখন শারীরিক গঠন অনুযায়ী সে ছেলে বা মেয়ে। এবার সে যে সমাজে জন্ম নিল সে সমাজ ও তার সংস্কৃতি অনুসারে তার ছেলে বা মেয়ে লিঙ্গের নির্মাণ হতে থাকে। অর্থাৎ মেয়ে হলে সে কেমন পোশাক পরবে, কেমন করে কথা বলবে, কি নিয়ে খেলবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আবার ছেলে হলে সে অন্য রকমভাবে বড় হবে। তার সমাজ ও সংস্কৃতি তাকে ছেলে হবার পরিভাষা শেখাবে।

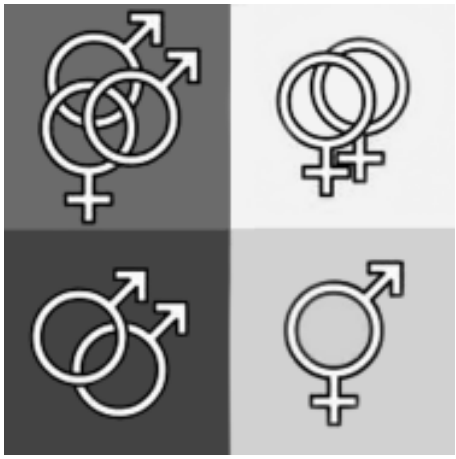

ভ্রূণ অবস্থায় যৌন-পরিচয় নির্ধারণ কী ভাবে হয়?

জিনগত যৌন-পরিচয় নিষেকের সময় অর্থাৎ ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে ভ্রূণ তৈরির প্রথম ধাপে নির্ধারিত হয়ে যায়। প্রথম কয়েক সপ্তাহে ভ্রূণের যৌন গ্রন্থি (Gonads) পৃথকীকৃত থাকে না। তারপর যে ক্রোমোজোম ভ্রূণকে পুরুষ করে অর্থাৎ Y ক্রোমোজোম থাকলে যৌন গ্রন্থি অন্ডকোষে পরিবর্তিত হয়। এই অন্ডকোষ থেকে পুরুষ হরমোন অর্থাৎ অ্যান্ড্রোজেন বা টেস্টোটেরন বেরোয়। তার প্রভাবে শরীরের ভিতরে ও বাইরে পুরুষ যৌনাঙ্গ তৈরি হয়—Epididymis, Vas, Ejaculatory duct, Penis, Scrotum। আর যদি Y ক্রোমোজোম না থাকে তা হলে যৌনগ্রন্থি ওভারিতে পরিণত হয়। আর তখন যৌনগ্রন্থিতে অ্যান্ড্রোজেন না থাকায় শরীরের ভিতরে ও বাইরে মহিলা যৌনাঙ্গ তৈরি হয়--- Fallopian tube, Uterus, Clitoris, Vagina। সব কিছু মসৃণভাবে চললে ভ্রূণের পুরুষ বা মহিলা যৌন-পরিচয় এ ভাবেই নির্ধারিত হয়। ক্রোমোজমের প্রকৃতি বিচার করলে স্বাভাবিক পুরুষের ক্রোমোজমে থাকে XY জোড় আর স্বাভাবিক মহিলার থাকে XX জোড়।

লিঙ্গ-পরিচয় ও যৌন-পরিচয় সংক্রান্ত সমস্যা

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাচ্চা যে যৌন-পরিচয় নিয়ে জন্মাল, পরবর্তী পর্যায়ে লিঙ্গ নির্মাণের সময় সে সেই যৌন-পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক পরিভাষা না গ্রহণ করে তার বিপরীত যৌন-পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত পরিভাষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। সে নিজেকে মনে মনে বিপরীত লিঙ্গ-পরিচয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে স্বচ্ছন্দবোধ করে। তার মনে হয় সে অন্য যৌন-পরিচয়ের দেহে ভুল করে আটকা পড়ে আছে। আসলে সে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ। যেমন একজন মানুষ শারীরিক গঠন অনুযায়ী হয়ত ছেলে, কিন্তু সে মানসিকভাবে নিজেকে মেয়ে ভাবতে থাকে। ফলে পোশাক,

কথাবার্তা, হাঁটাচলা সব কিছু মেয়েদের মত করতে চায়। ঠিক সেরকম ভাবে একজন মেয়ে মানসিকভাবে নিজেকে ছেলে ভাবতে পারে। এই সমস্যার ডাক্তারি পরিভাষা হল জেন্ডার ডিসফোরিয়া। চলতি ভাষায় এই রোগে আক্রান্ত মানুষদের ট্রান্সসেক্সুয়াল বলা হয়। এখানে একটা বড় প্রশ্ন মনে জাগে। ট্রান্সসেক্সুয়ালিটি কি রোগ না জন্মগত বৈশিষ্ট্য? সে প্রসঙ্গে আসার আগে জানিয়ে রাখা ভাল যে ট্রান্সসেক্সুয়ালিটি কিন্তু ক্রস-ড্রেসিং বা ট্রান্সভেসটিটিসমের থেকে আলাদা। যারা ট্রান্সভেসটাইস তারা কেবল নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের মত দেখতে হলেই খুশি থাকে। এই আচরণের কোনও বায়োলজিক্যাল বা গর্ভস্থিত অবস্থাজনিত ভিত্তি নেই। এই আচরণ শিখনের ফল। ইদানিং কালে ট্রান্সজেন্ডারইজম বলে একটা টার্ম ব্যবহার করা হচ্ছে। যারা ক্রসড্রেসার, যারা উভলিঙ্গ ট্রান্সসেক্সুয়াল তাদের সবাইকে এক সঙ্গে বোঝানোর জন্য একটাই শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। সে শব্দটা হল ট্রান্সজেন্ডার। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে ট্রান্সসেক্সুয়ালদের তফাত হল, অন্যরা কেউই নিজেদেরকে অন্য যৌন-পরিচয়ের জালে আটকে পড়া ভাবে না ও তার জন্য যে অসম্ভব মানসিক টানাপড়েন তৈরি হয় তাতে কষ্ট পায় না। ট্রান্সসেক্সুয়াল মানুষরা এক বিশেষ মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায়। এদের শারীরিক গঠন যে যৌন-পরিচয় প্রকাশ করে মন থেকে এরা নিজেদেরকে সেই লিঙ্গের মানুষ মনে করে না। তার বিপরীত লিঙ্গের মানুষ মনে করে। কিন্তু এই মনে হওয়াটা মোটেই শুধু মনে হওয়া থাকে না, এই দ্বন্দ্ব তাদের চূড়ান্ত মানসিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। তাদের কাছে এই অসঙ্গতি জীবন-মৃত্যুর সমান।

হরমোনের প্রভাবে জেন্ডার ডিসফোরিয়া হতে পারে। স্বাভাবিক যৌন বিকাশের জন্য গর্ভে থাকা অবস্থায় যে সব হরমোন প্রয়োজন তার হেরফের হলে এই অবস্থা হতে পারে। হয়তো শিশুটি দৈহিক গঠনে ছেলে অথচ মানসিক গঠন তার মেয়ের মত। তবে জেন্ডার ডিসফরিয়ার কারণ সঠিক ভাবে এখনও জানা যায় নি।

কী কারণে জেন্ডার ডিসফোরিয়া হয়?

হরমোনের প্রভাবে জেন্ডার ডিসফোরিয়া হতে পারে। স্বাভাবিক যৌন বিকাশের জন্য গর্ভে থাকা অবস্থায় যে সব হরমোন প্রয়োজন তার হেরফের হলে এই অবস্থা হতে পারে। হয়তো শিশুটি দৈহিক গঠনে ছেলে অথচ মানসিক গঠন তার মেয়ের মত। তবে জেন্ডার ডিসফোরিয়ার কারণ সঠিক ভাবে এখনও জানা যায় নি।

Disorder of Sexual Development, সংক্ষেপে DSD কী?

DSD হল জন্মগত ত্রুটির ফলে সৃষ্ট যৌন সমস্যা যার ফলে কোনও কোনও মানুষের যৌনাঙ্গের গঠন বা ক্রোমোজোমের প্রকৃতি বা লিঙ্গ-পরিচয় সাধারণ মানুষের তুলনায় আলাদা হয়ে ওঠে। তখন আমরা পাই কোনও পিঙ্কি প্রামাণিককে। এখানে আরও একটা বিষয় দেখে নেওয়া যাক। এক সময় এবং এখনও সাধারণ ভাবে intersex, hermaphroditism, pseudohermaphroditism এই কথাগুলো চালু আছে এই ধরনের উভলিঙ্গের চিহ্নধারী মানুষদের জন্য। কিন্তু এই পরিভাষাগুলোর সঙ্গে একটা অশ্রদ্ধা মেশানো থাকে, যেমন আমাদের দেশে হিজরাদের প্রতি থাকে। তাই শুধু মানুষ নয় অন্য কোনও জীবজন্তু সম্পর্কেও এই পরিভাষা ব্যবহৃত হয় না। বরং এই ধরনের মানুষের বর্ণনায় ফুল গাছের সাদৃশ্য খোঁজা হয়। অধিকাংশ ফুলগাছে যেমন পুং এবং স্ত্রী দু'ধরনের ফুল ধরে এরাও সেরকম শরীরে দু'ধরনের লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করে। সে আলোচনায় আসার আগে মোটামুটিভাবে দেখে নেওয়া যাক এই সমস্যায় কী কী হয় ও কেন হয়?

ডিএসডি-র মধ্যে সব থেকে বেশি দেখা যায় কনজেনিটাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লেসিয়া বা সংক্ষেপে সিএএইচ। এই রোগে আক্রান্ত মানুষের XX ক্রোমোজোম থাকে যা মেয়েদের শরীরে দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের যৌনাঙ্গ অনেকটা ছেলেদের যৌনাঙ্গের মত দেখতে হয়। আসলে অ্যান্ড্রোজেন বা টেস্টোস্টেরন অন্ডকোষ ছাড়া অন্য উৎস থেকে বেরোলেও তার প্রভাবে দেহে পুরুষ যৌনাঙ্গের প্রকাশ দেখা যায়। সিএএইচ যদি সামান্য পরিমাণে থাকে তা হলে ক্লাইটরিস অল্প বড় থাকে। কিন্তু রোগের পরিমাণ মারাত্মক হলে শুধু চোখে দেখে বোঝা যায় না শিশুটি ছেলে না মেয়ে। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির সমস্যা থাকলে সিএএইচ হয়। সিএএইচ যাদের থাকে সেই সব শিশুরা (যদি তাদের ক্রোমোজোম XX হয়) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদেরকে মেয়ে ভাবে। যখন অ্যাড্রেনালের এই সমস্যা XY ক্রোমোজোমযুক্ত মানুষের অর্থাৎ কোনও ছেলের হয়, তখন তার ফলে তার মধ্যে অতিরিক্ত পুরুষালি ভাব এবং অল্প বয়সে যৌবনোদ্গমের সমস্যা দেখা যায়।

আর এক ধরনের ডিএস.ডি. হল অ্যান্ড্রোজেন ইন্সেনসিটিভিটি সিন্ড্রোম। এই রোগে পুরুষ ক্রমোজোম XY থাকা সত্ত্বেও শরীর টেস্টোস্টেরন হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না, ফলে তাদের মধ্যে মেয়েলি ভাব দেখা যায়। পুরোপুরিভাবে এই রোগ থাকলে মানুষটির চেহারা মেয়েদের

মত হয়, এমন কি বয়সকালে স্তনের বৃদ্ধি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে কিশোর বয়স পর্যন্ত এই অসুখ ধরা পড়ে না। যখন মেয়েদের মাসিক ঋতুচক্র শুরু হতে দেরি হয় তখন ধরা পড়ে এই অসুখ। এই রোগের তীব্রতা কম হলে (যাকে পারসিয়াল অ্যান্ড্রোজেন ইন্সেনসিভিটি সিন্ড্রোম বলা হয়) যৌনাঙ্গের হেরফের হতে পারে—কিছুটা মেয়েদের মতো বা সম্পূর্ণ ভাবে ছেলেদের মতো। পারসিয়াল অ্যান্ড্রোজেন ইন্সেনসিটিভিটি সিন্ড্রোম আক্রান্তদের অনেকে নিজেকে মেয়ে আবার অনেকে ছেলে মনে করে। এই অসুখের চিকিৎসা হরমোনের মাধ্যমে বা অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে করা হয়।

আর এক ধরনের ডিএসডি হল ফাইভ আলফা রিডাকটেস ডেফিসিএনসি। সাধারণ ভাষায় বলা হয় পেনিস অ্যাট টুয়েলভ। জীবনের একদম শুরুর দিকে টেস্টোস্টেরন হরমোনকে উজ্জীবিত করতে যে এনজাইম প্রয়োজন হয় তার অভাবে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের বৈশিষ্ট্য হল XY ক্রোমোজোম আছে এমন মানুষের শরীর বয়ঃসন্ধির আগে মেয়েদের মত দেখতে লাগে। বয়ঃসন্ধির পরে টেস্টোস্টেরন হরমোনকে উজ্জীবিত করতে যে এনজাইম প্রয়োজন হয় তা পাওয়া যায় বলে শরীর আস্তে আস্তে পুরুষের আকার ধারণ করে। ছোট বয়সে ধরা পড়লে শিশুটিকে ছেলে হিসাবে বড় করা হয় কারণ এই রোগে আক্রান্ত মানুষরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদেরকে পুরুষ ভাবে।

পিঙ্কি প্রামাণিকের ডিএনএ টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী সে কনজেনিটাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লেসিয়া বা সংক্ষেপে সিএএইচ-তে আক্রান্ত। সিএএইচ ও অ্যানড্রোজেন ইন্সেনসিটিভিটি সিন্ড্রোম এই দু'ধরনের রোগের চিকিৎসা সম্ভব। চিকিৎসা করলে এই রোগে আক্রান্ত মানুষ বেশ কিছুটা হলেও স্বাভাবিক সামাজিক ও যৌন জীবন কাটাতে পারেন।

সম্প্রতি বাংলা সিনেমার বিখ্যাত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের মৃত্যুতে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। কিন্তু একই সঙ্গে ওনাকে ঘিরে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। ইদানিং কালে উনি সাজ-পোশাকে, দৈহিক গঠনে নিজেকে এক নতুন পরিচয়ে সবার সামনে উপস্থিত করেছিলেন। নিজের এক ইন্টারভিউতে উনি বলেছিলেন উনি না পুরুষ না নারী। উনি মাঝামাঝি অর্থাৎ উভলিঙ্গ বা ইংরাজিতে যাকে বলা হয় ইন্টারসেক্স। যারা এই পর্যায়ে থাকে তারা নিজেদের ইচ্ছামত নারী বা পুরুষের লিঙ্গ পরিচয় ধারণ করে। তার জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার করতেও তারা পিছপা হয় না। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামের যাত্রা-রানি চপলা ওরফে চপল ভাদুড়ী আসলে পুরুষের দেহে আটকে পড়া নারী। অর্থাৎ তিনি ট্রান্সসেক্সুয়াল। তাঁকে নিয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমা ''আর একটি প্রেমের গল্প''।

এই উভলিঙ্গ মানুষদের Gender dysphoria বা transsexual যে নামেই ডাকা হোক সমস্যাটা হল বিপরীত লিঙ্গের শরীরের খাঁচায় আটকে পড়া একটা অন্য লিঙ্গের মানুষ। আর সেটাই তার মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ যা তাকে নিয়ে যায় গভীর বিষাদে এবং সেই বিষাদ থেকে আত্মহনন। দেখা গেছে শতকরা ৫০ ভাগ এমন মানুষ ৩০ বছর বয়সের আগে নিজেকে শেষ করে দেয়। অথচ বৃত্তি ও শৈল্পিক চেতনার মানে এদের অধিকাংশই সাধারণ মানুষের থেকে উঁচুতে থাকে। আর এখানেই আসছে সমাজের ভূমিকা। সমাজের বেঁধে দেওয়া লিঙ্গ-নির্মাণের ধারণার বাইরে গেলে সে সমাজ-বর্হিভূত অস্বাভাবিক 'জীব' এই চিন্তা থেকে বেরোনোর সময় এসেছে— তা না হ'লে ঋতুপর্ণরা অকালেই ঝরে যাবে।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টচার্য, মনোবিদ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।
ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটা চিকিৎসাকেন্দ্রের মনোচিকিৎসক।

ADVERTISEMENT

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হয়েছে একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজনে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হয়।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, ফোন : ৯৮৩০৯২২১৯৪

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন : ৯০৮৮০৫০৫২৫

আইবিএস বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম

বাঙালি মাত্রেই নাকি পেটরোগা, আর সেই পেটের রোগের কারণ না কি আমাশা। আর সেই আমাশা নাকি অ্যামিবিয়াসিস, আর পেটের সেই অ্যামিবা মারতে মেট্রোনিডাজোল (মেট্রোজিল, ফ্ল্যাজিল ইত্যাদি) বা আরও সব জোরালো ওষুধ খেতে হয়। ওষুধের দোকানে এই সব ওষুধ দোকানদাররা বিনা প্রেসক্রিপশনেই ব্যবহার করেন, আর ডাক্তারবাবুরাও হরদম লিখে থাকেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেক 'আমাশা' রোগী আদৌ অ্যামিবিয়াসিসে ভোগেন না। একটা বড় সংখ্যক ভোগেন আইবিএস-এ, আর তাঁদের ঠিক চিকিৎসায় অনেক ভাল রাখা যায়—
লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**

'ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম'-এর বাংলা পরিভাষা প্রায় রোগটার মতোই কষ্টদায়ক— 'উপদাহী অন্ত্রের উপসর্গসমূহ'। তাই আমরা ছোট্ট নাম আইবিএস-ই মনে রাখব। ডিজিজ বা রোগ নয়—সিনড্রোম। সিনড্রোম মানে উপসর্গসমূহ, অর্থাৎ শরীর খারাপ হলে রোগীর যে সব কষ্ট হয়, সেগুলো। পেট কামড়ানো, পেটফাঁপা, কখনও পাতলা পায়খানা, কখনও পায়খানা কষে যাওয়া—এসব হল আইবিএস-এর উপসর্গ।

আমার এক ডাক্তার বন্ধুর আইবিএস আছে। ওরাল পরীক্ষা দিতে যাবে বা চাকরির ইন্টারভিউ, পেটটা গুড়গুড়িয়ে উঠল, শৌচাগারে না গেলেই নয়। সিনেমা দেখতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল পেটটা তো পরিষ্কার হয়নি, ছুটতে হল শৌচাগারে। দূরপাল্লার ট্রেনে উঠলে সমস্যা নেই, লোকাল ট্রেনে (যাতে শৌচাগার নেই) ওঠার আগে স্টেশনে একবার শৌচাগারে যাওয়া চাই-ই। সে সুলভ শৌচালয়ের আগের জমানার মানুষ, তার জানা ছিল শহরের কোথায় কোথায় কী ভাবে শৌচাগারের সুবিধা পাওয়া যায়। এখন তাকে ট্রেনে করে কর্মস্থলে যেতে হয় না, কিন্তু গাড়িতে ওঠার আগে শৌচাগার-দর্শনের অভ্যাস কাটাতে পারেনি সে আজও।

সাধারণত ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে আইবিএস-এর উপসর্গ প্রথমবার দেখা যায়। প্রায়শই চাপের সময়ে বা নির্দিষ্ট কিছু খাবার খাওয়ার পরে উপসর্গগুলো দেখা যায়। কারোর উপসর্গের তীব্রতা বেশি, কারোর কম। অধিকাংশ মানুষ হয় ডায়রিয়া না হয় কোষ্ঠকাঠিন্য, অথবা বা দু'য়েই ভোগেন। এছাড়াও মলের মধ্যে শ্লেষ্মা বা আম থাকতে পারে।

শৌচাগারে গিয়ে মলত্যাগ করার পর পেট কামড়ে ব্যথা হয়। সাধারণত খাওয়ার পর উপসর্গগুলো দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে উপসর্গের তীব্রতা বাড়ে, ২-৪ দিন এমন চলে, তারপর কষ্ট কমে, কিন্তু একেবারে ভাল হয়ে যায় না।

আইবিএস-এর যে উপসর্গগুলো বেশি দেখা যায়—

- পেটে ব্যথা, পেট কামড়ানো—পায়খানা করলে কষ্ট কমে
- পায়খানায় পরিবর্তন—ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনও দুই-ই
- পেট ফাঁপা
- পেটে বেশি গ্যাস হওয়া, বেশি বাতকর্ম হওয়া
- হঠাৎ করে শৌচাগারে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা, যেতে তর সয় না
- পায়খানা করে আসার পরপর-ই আবার পায়খানা পাওয়া
- পায়খানা করে পেট পরিষ্কার হল না— এমন মনে হওয়া
- মলদ্বার দিয়ে আম যাওয়া
- আইবিএস-এর জন্য যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার জন্য রোগী অনেক সময় অবসাদ বা উদ্বেগে ভোগেন।

আইবিএস-এর প্রধানত তিনটে ধরন :

১। ডায়রিয়া প্রধান আইবিএস
২। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রধান আইবিএস
৩। ডায়রিয়া-কোষ্ঠকাঠিন্য মিশ্র আইবিএস

সব সময় যে একজন একই ধরনের উপসর্গে ভুগবেন এমন নয়, উপসর্গ বদলাতে পারে, এমনও হতে পারে যখন দীর্ঘ সময় ধরে কোনও উপসর্গ নেই বা অল্প উপসর্গ আছে।

যে উপসর্গ থাকলে অবহেলা করা উচিত হবে না

আইবিএস-এর মতো উপসর্গের সঙ্গে যদি নীচের উপসর্গগুলো থাকে তাহলে হয়তো আইবিএস নয়, অন্য কোনও গুরুতর সমস্যা রয়েছে:

- ওজন কমছে, অথচ কারণ বোঝা যাচ্ছে না
- পেটে বা মলদ্বারের কাছে কোনও ফোলা
- মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়া
- রক্তাল্পতা

আইবিএস কেন হয়?

আইবিএস ঠিক কী কারণে হয় তা এখনও অজানা। তবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করেন খাদ্যনালীর সমস্তটার অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রবণতাই আইবিএস-এর কারণ। আমরা খাবার খাওয়ার পর খাদ্যনালীর ছন্দবদ্ধ সংকোচন-প্রসারণে তা নীচে নামে। এই সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তন আইবিএস-এর কারণ হতে পারে। হয় খাবার খাদ্যনালী দিয়ে বেশি তাড়াতাড়ি নামে, খাবার থেকে জল শোষিত হওয়ার সময় পায় না— ফল ডায়রিয়া। অথবা আস্তে আস্তে নামে, খাবার থেকে বেশি জল শোষিত হয়ে যায়— ফল কোষ্ঠবদ্ধতা। যেটাই হোক না কেন, পেটে অস্বস্তি হয়। আবার খাদ্যনালীর ব্যথার প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীল হওয়াও কারণ হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় ফুড পয়জনিং-এর পর আইবিএস শুরু হতে। বোধহয় খাদ্যনালী থেকে মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক থেকে খাদ্যনালীতে যে সংকেতগুলোর আসা-যাওয়া ঠিকঠাক কাজ হওয়ার জন্য জরুরি, তাতে কোনও বিঘ্ন ঘটে।

5-hydroxytryptamine (5-HT) নামের একটা রাসায়নিক আছে, বিশেষ কিছু খাবার খাওয়ার পর এবং মানসিক চাপের সময় শরীরে এর মাত্রা বাড়ে। আইবিএস-এ খাদ্যনালীর স্বাভাবিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটানোর পেছনে তার ভূমিকা আছে বলেও মনে করা হয়।

কিছু মানসিক কারণও থাকতে পারে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার মানে কিন্তু এমনটা নয় যে আইবিএস মানসিক রোগ। মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মতো আবেগের তীব্রতা শরীরে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন আনতে পারে যাতে করে খাদ্যনালীর স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ব্যাহত হয়। যেসব মানুষের আগে আইবিএস ছিল না, কঠিন পরীক্ষা বা চাকরির ইন্টারভিউ-র আগে তাঁদের আইবিএস-এর মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যাঁদের আইবিএস আছে, তাঁদের অনেককে ছোটবেলায় যৌন নির্যাতন, অবহেলা, বড় কোনও অসুখ বা পরিবারে কোনও নিকটজনের মৃত্যুর মতো আঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। হয়ত এসব অভিজ্ঞতা তাঁদের চাপ, ব্যথা-বেদনার অনুভূতির প্রতি বেশি সংবেদনশীল করে তুলেছে।

আইবিএস-এর উপসর্গ শুরু করে কারা?

দেখা গেছে নির্দিষ্ট কিছু খাবার ও পানীয় উপসর্গ শুরু করতে পারে—তবে সবারই যে সব কিছুতে হবে এমন নয়। এগুলো হল :

- মদ
- ঠাণ্ডা পানীয় (যেগুলোতে গ্যাস মেশানো থাকে)
- চকোলেট
- চা-কফি-কোলার মতো ক্যাফিন-যুক্ত পানীয়
- প্যাকেটের জলখাবার—বিস্কুট বা মুচমুচে
- বেশি তেল-চর্বিযুক্ত খাবার
- ভাজা খাবার।

আইবিএস-এর রোগী যদি খাবার-দাবারের ডায়েরি রাখেন, তা হলে কোন খাবারে উপসর্গ হচ্ছে, বুঝতে সুবিধা হয়।

এছাড়া, আগেই বলেছি মানসিক চাপও আইবিএস-এর উপসর্গ শুরু করতে পারে। তাই মানসিক চাপ কমানোও আইবিএস-এর চিকিৎসার মধ্যে অন্যতম।

কখন ডাক্তার দেখাবেন?

যদি আপনার মনে হয় আইবিএস হচ্ছে, তা হলে ডাক্তার দেখানো উচিত। ডাক্তার দেখে নেবেন আপনার অন্ত্রে কোনও জীবাণু-সংক্রমণ আছে কিনা, সিলিয়াক ডিজিজ কি না (যে রোগে রোগী গ্লুটেন সহ্য করতে পারেন না) বা খাদ্যনালিতে কোনও দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ আছে কি না।

রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

আইবিএস-এ খাদ্যনালিতে কোনও নির্দিষ্ট অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায় না বলে সাধারণত কোনও পরীক্ষা করার দরকার নেই। শারীরিক পরীক্ষা করে ও উপসর্গ দেখেই ডাক্তার আইবিএস সন্দেহ করেন :

- পেটে ব্যথা বা পেট ফাঁপা যদি মলত্যাগ করলে কমে যায় বা
- পেট ব্যথা বা পেট ফাঁপার সঙ্গে যদি মাঝে মাঝে ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে বা
- স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিবার যদি পায়খানা করতে হয়।

নীচের উপসর্গগুলোর মধ্যে যেকোনও দুটো থাকলে রোগ-নির্ণয় নিশ্চিত হয়ঃ

- পায়খানা করার জন্য চাপ দিতে হওয়া, হঠাৎ করে জোর পায়খানা পাওয়া বা পায়খানা করার পরও যেন পেট খালি হল না মনে হওয়া
- পেট ফাঁপা, পেটে শক্তভাব বা চাপ অনুভব করা
- খাওয়ার পর উপসর্গগুলো বেড়ে যাওয়া
- মলদ্বার দিয়ে আম পড়া।

আইবিএস-এর উপসর্গের সঙ্গে যদি কারণ ছাড়া ওজন কমা, পেটে বা মলদ্বারের কাছে কোনও ফোলা, মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়া বা রক্তাল্পতা থাকে তা হলে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কোনও গুরুতর রোগ আছে কি না।

আইবিএস একনজরে

সেসব পরীক্ষার মধ্যে প্রয়োজন হতে পারে ঃ

- সিগময়েডোস্কোপি (sigmoidoscopy)-র, যাতে একটা সরু নমনীয় নল মলদ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে বৃহদন্ত্রের নিচের অংশ দেখা হয়। বা
- কোলনোস্কোপি (colonoscopy)-র যাতে নল দিয়ে পুরো বৃহদন্ত্রটাকেই দেখা হয়।

আইবিএস থেকে গুরুতর কোনও রোগ হতে পারে কি?

না। আইবিএস-এর উপসর্গগুলো খুব কষ্টদায়ক বা অস্বস্তিকর হলেও এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে এ থেকে ক্যানসার বা খাদ্যনালীর অন্য কোনও গুরুতর রোগ হয়।

আইবিএস-এর চিকিৎসা

নিজের খাদ্যভ্যাস ও জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন এনে ও রোগটার স্বরূপ বুঝে এর উপসর্গগুলোকে কমিয়ে রাখা যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওষুধ বা মনোচিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

আইবিএস-এ খাবার দাবার

একই রকম খাদ্যতালিকা সব আইবিএস রোগীর জন্য কাজের এমন নয়।

ছিবড়ে (Fibre)—আমাদের খাবারে দু' ধরনের ছিবড়ে থাকে। এক ধরনের ছিবড়ে দ্রাব্য, শরীর সেগুলো হজম করে। আরেক ধরনের ছিবড়ে অদ্রাব্য, শরীর তাকে হজম করতে পারে না। দ্রাব্য ছিবড়ে আছে কলা, আপেলের মতো ফলে, গাজর, আলুর মতো মাটির নিচের তরকারিতে। অদ্রাব্য ছিবড়ে আছে ভূষিশুদ্ধ আটার রুটিতে, ভূষি, শস্যদানা, বাদামে।

ডায়রিয়া-প্রধান আইবিএস-এ খাদ্যে অদ্রাব্য ছিবড়ের পরিমাণ কমালে লাভ হয়। ফল ও তরকারির খোসাও না খাওয়া উচিত।

কোষ্ঠকাঠিন্য-প্রধান আইবিএস-এ খাবারে দ্রাব্য ছিবড়ের পরিমাণ বাড়ানো উচিত এবং জল খাওয়ার পরিমাণ বাড়ানো উচিত।

আইবিএস রোগীদের যা যা করা উচিত সেগুলো হল:

- সময়মত খাবার খাওয়া, সময় নিয়ে চিবিয়ে খাওয়া

- কোন খাবার বাদ না দেওয়া, দুটো খাবারের মধ্যে যেন বড় সময়ের অন্তর না থাকে
- দিনে অন্তত ৮ কাপ জল ও চা-কফি বাদে অন্য তরল খেতে হবে
- চা-কফি দিনে ৩ কাপের বেশি নয়
- মদ ও ঠান্ডা পানীয়ের পরিমাণ কমাতে হবে
- অদ্রাব্য ছিবড়ে-যুক্ত খাবারের পরিমাণ কমাতে হবে
- কাঁচা ফল বেশি খাওয়া যাবে না
- ডায়রিয়া থাকলে সরবিটল (যা চিনি ছাড়া মিষ্টি, ঠান্ডা পানীয়, চুইং গাম ইত্যাদি মিষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়) এড়িয়ে যেতে হবে, ইত্যাদি।

আইবিএস-এ ব্যায়াম

দেখা যায় শারীরিক ব্যায়ামে অধিকাংশ আইবিএস রোগীর লাভ হয়। দিনে আধ ঘণ্টা, সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ব্যায়াম করা দরকার। ব্যায়াম এমনটা হবে যাতে ব্যায়াম করে শ্বাসগতি ও নাড়ীর গতি বাড়ে। জোরে হাঁটা, দৌড় বা চড়াই চড়া এমন ব্যায়ামের উদাহরণ।

আইবিএস-এ ওষুধ-বিষুধ : প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় :

প্রোবায়োটিকস (Probiotics)— ওষুধ কোম্পানিগুলো বলে এতে নাকি হজম ভাল হয়। এ সবে তথাকথিত 'বন্ধু ব্যাক্টেরিয়া' থাকে যারা খারাপ ব্যাক্টেরিয়াগুলোকে নাকি নষ্ট করে দেয়। এগুলোর ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত নয়।

পেট কামড়ানো কমানোর ওষুধ (antispasmodic medicines)—এগুলো ব্যবহার করা যায় পেট ব্যথা হলে।

মল নরম করার ওষুধ (laxatives)—ব্যবহার করা হয় কোষ্ঠকাঠিন্যে।

অন্ত্রের গতি কমানো ওষুধ (antimotility medicines)— যেমন লোপেরামাইড ব্যবহার করা হয় ডায়রিয়া কমাতে।

অবসাদরোধী ওষুধ (antidepressants)--- অ্যামিট্রিপ্টিলিন (Amitriptyline), সিটালোপ্রাম (citalopram), ফ্লুওক্সোটিন (fluoxetine), পারোক্সেটিন (paroxetine) আইবিএস-এ ব্যবহার করা হয়। এরা অবসাদ কমানোর সাথে সাথে পেটে ব্যথা সারাতেও সাহায্য করে।

১২ মাস চিকিৎসা চালানোর পরেও যদি উপসর্গ না কমে তা হলে গ্রেট ব্রিটেনে এরপর মানসিক চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া হয়। সেগুলোর মধ্যে আছে—সম্মোহন চিকিৎসা (Hypnotherapy), সাইকোডায়নামিক ইন্টারপার্সোনাল থেরাপি (Psychodynamic interpersonal therapy-PIT), কগনিটিভ বিহেভেরিয়াল থেরাপি (cognitive behavioural therapy-CBT), ইত্যাদি।

মনে রাখুন আইবিএস সারিয়ে ফেলা না গেলেও খাদ্যাভ্যাস আর জীবনশৈলীতে পরিবর্তন এনে উপসর্গগুলোকে কমিয়ে রাখা যায়। ওষুধ ব্যবহার করেও ফল মেলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে।

লেখক পরিচিতি : ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, জনস্বাস্থ্য-আন্দোলনের কর্মী ও হাওড়ায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়া একটি ক্লিনিকের পুরো সময়ের চিকিৎসক।

RKG R K G Pharma Pvt. Ltd.
79, Pally Mangal Colony, (Thakurgakur P.S.) Kolkata-700 063, Tel: (033) 2497 6567
Marketing Control
" NEURO-PSYCHIATRY IS OUR BASE,
LONG PRODUCT BASKET IS OUR FACE,
MEETING COMMITMENT IS OUR ADDRESS,
STRONG PRESENCE IS ON YOUR BLESS".
Visit us at : www.rkgpharmaindia.com
H. O. : 12th, Mile Stone, Mathura Road, Faridabad - 121 003
Telefax : 0129-2274211, 2274199 Email : rkgpharma12@yahoo.co.in
ISO 9001 : 2000 COMPANY

অ্যাসিড খাওয়া রোগীর চিকিৎসা

আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করতে গিয়েই হোক, আর হোক নিছক দুর্ঘটনা, অ্যাসিড খাওয়া আমাদের দেশে বেশ সাধারণ ঘটনা। অ্যাসিড খেয়ে যাঁরা মারা গেলেন তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু যাঁরা বেঁচে রইলেন তাঁদের খাদ্যনালী প্রায়ই সরু হয়ে বন্ধই হয়ে যায়। হাসপাতাল থেকে একদিন ছাড়া পান তাঁরা, কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন না, পেটে অস্ত্রোপচার করা এক ছিদ্র দিয়ে তাঁদের খেতে হয়, মুখের থুতুটুকু পর্যন্ত গিলতে পারেন না অনেকে। এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভাল ছিল—এমনই ভাবতে শুরু করেন তাঁরা, আর হয়তোবা তাঁদের পরিজনও। অথচ এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ রয়েছে, এবং তা রয়েছে আমাদের এই রাজ্যেই—
লিখছেন **ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী**।

প্রায়ই আমরা সংবাদপত্রে কিংবা পাড়া প্রতিবেশীদের আলোচনায় অ্যাসিড খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হওয়া এমন কি মারা যাওয়ার খবর জানতে পারি। মানসিক সমস্যা, পারিবারিক বিবাদ, দাম্পত্য কলহ, এমনকি বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি এ সব কারণে আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় মানুষ, বিশেষত মেয়েরা, অ্যাসিড খান। এ ছাড়া অসাবধানতা জনিত কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বাথরুম পরিষ্কার করার জন্যে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা মিউরিয়াটিক অ্যাসিড এই সব ঘটনার জন্য সাধারণত দায়ী, তবে কিছু কিছু সময় নাইট্রিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড এগুলোও খাওয়া হয়ে থাকে।

দেখা যায় শ্বাসনালির মুখে প্রদাহজনিত কারণে প্রবেশ পথটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গলায় ফুটো করে শ্বাসনালির বিকল্প পথ করে দেওয়া হয়, একে 'ট্র্যাকিওস্টমি' বলে। এরকম কষ্টকর অবস্থায় ভুগতে ভুগতে রোগীদের মানসিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে।

• তখনই কী করবেন?

অ্যাসিড খাওয়ায় অসুস্থ রোগীদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা হয় যে রোগী বা রোগীনির খাদ্যনালী কিংবা পাকস্থলিতে কোনো ফুটো হয়েছে কি না। ফুটো হলে জরুরী ভিত্তিতে অপারেশান করতে হয়। অন্যথা রোগী শিরাতে স্যালাইন ও চিকিৎসকের পরামর্শমতো নানান ওষুধ দেওয়া হয়। খাদ্যনালী বা অন্ত্রে ফুটো হলে রোগী খুবই সঙ্কটজনক অবস্থায় থাকেন— এ থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব বেশি। এ ছাড়া রক্তবমি বা রক্ত পায়খানা হলে রোগীকে রক্ত দিতে হয়। ধীরে ধীরে রোগীর অবস্থা উন্নতি হলে মুখে খেতে দেওয়া হয়। রোগী মুখে খেতে না পারলে পেট কেটে খাবার দেবার রাস্তা করা হয়। একে বলা হয় 'ফিডিং জেজুনোস্টমি। রোগীর অবস্থার উন্নতি হলে তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়।

• সমস্যা কি পুরো চলে যায়?

মুখে খেতে পারেন না। এমনকি থুতু গিলতেই তাঁদের সমস্যা। এবং এই সমস্যা দীর্ঘমেয়াদী হলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। থুতু ফেলার বাটি হাতে আর পেটের নল দিয়ে তরল খাবার গ্রহণ করেই তাঁদের জীবন কাটতে থাকে। অনেক রোগী প্রথম প্রথম মুখে খেতে পারলেও পরে ধীরে ধীরে খাবার গিলবার কষ্ট শুরু হয়, প্রথমে শক্ত খাবার পরে তরল খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কারও কারও খাবার খেলেই বমি হতে থাকে। তাঁদের আপৎকালীন সমস্যা সমাধানে পেটে নল ঢুকিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। এ সমস্ত রোগীদের কারও কারও প্রথম থেকে বা কয়েকদিন পর শ্বাসের সমস্যা শুরু হয়। দেখা যায় শ্বাসনালির মুখে প্রদাহজনিত কারণে প্রবেশ পথটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গলায় ফুটো করে শ্বাসনালির বিকল্প পথ করে দেওয়া হয়, একে 'ট্র্যাকিওস্টমি' বলে। এরকম কষ্টকর অবস্থায় ভুগতে ভুগতে রোগীদের মানসিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। আগে থেকে মানসিক সমস্যা থাকলে তা আরও বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের মানসিক সমস্যার জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হয়।

মুখে খেতে পারেন না। এমনকি থুতু গিলতেই তাঁদের সমস্যা। এবং এই সমস্যা দীর্ঘমেয়াদী হলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। থুতু ফেলার বাটি হাতে আর পেটের নল দিয়ে তরল খাবার গ্রহণ করেই তাঁদের জীবন কাটতে থাকে। অনেক রোগী প্রথম প্রথম মুখে খেতে পারলেও পরে ধীরে ধীরে খাবার গিলবার কষ্ট শুরু হয়, প্রথমে শক্ত খাবার পরে তরল খাওয়াতে বন্ধ হয়ে যায়। কারও কারও খাবার খেলেই বমি হতে থাকে।

- **এঁদের কি কিছু করা যায়?**

এই সমস্ত জটিল রোগীদের পরীক্ষা করে দেখা হয় খাদ্যনালির কোন্ কোন্ অংশে অবরোধ হয়েছে। বেরিয়াম এক্সরে পরীক্ষা করে খাদ্যনালি এবং পাকস্থলির অবস্থার মূল্যায়ণ করা হয়। যদি কেবলই পাকস্থলির রাস্তা বন্ধ থাকে তা হলে জেনারেল সার্জন পেট কেটে পাকস্থলির বিকল্প রাস্তা করে দেন। একে গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি বলা হয়। এটি তুলনামূলক ভাবে কম জটিল অবস্থা।

কখনও কখনও অ্যাসিডে পুড়ে গিয়ে ও তারপরে প্রদাহের ফলে রোগীর গ্রাসনালি সরু হয়ে যায়। এই সরু অংশটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের হলে তাকে 'ডাইলেটর'-এর সাহায্যে চওড়া করা হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই চিকিৎসার ফলে রোগী মুখে খাবার খেতে পারেন।

- **সবচেয়ে জটিল রোগীদের কি আশা আছে?**

যে সব রোগী থুতুও গিলতে পারেন না তাঁদের সমস্যা সবচেয়ে জটিল। সে ক্ষেত্রে প্রথমে গলায় ফুটো করে ডাইলেটরের সাহায্যে কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে খাদ্যনালির উপরিভাগকে প্রস্তুত করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে নতুন করে খেতে বা গিলতে শেখানো হয়। প্রায় ২ থেকে ৬ সপ্তাহ গলা ভাত, তরল খাদ্য গিলতে শিখতে হয়। এরপরে খাদ্যনালির বিকল্প পথ তৈরি করা হয়। এই অপারেশানটি অত্যন্ত জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। অপারেশনটির নাম কোলন বাইপাস সার্জারি। বৃহদন্ত্রের একটি অংশকে রক্ত সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রেখে তার একপ্রান্ত গলায় খাদ্যনালির সাথে এবং অন্যপ্রান্ত পেটে পাকস্থলির সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। বুকের খাঁচার সামনের যে হাড় 'স্টারনাম', সেই হাড়ের সামনে দিয়ে অথবা পেছন দিয়ে বৃহদন্ত্র গঠিত এই বিকল্প রাস্তা তৈরী হয়। ধীরে ধীরে রোগী মুখে খেতে শুরু করেন। প্রথমে তরল তারপর গলা ভাত এবং সবশেষে শক্ত খাবার খেতে পারেন তিনি।

হাতে গোনা দু'একজনের ক্ষেত্রে মুখের ভেতরে শ্বাস ও খাদ্যনালির সাধারণ প্রবেশ দ্বারটি সরু হয়ে যায়। সেই সব রোগীকে মুখে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে স্থায়ীভাবে ট্র্যাকিওস্টমি করতে হয়,এবং এই রোগীরা কথা বলতে পারেন না। ফলত রোগীর মানসিক অবস্থা দুঃসহ হয়ে ওঠে।

- **জটিল রোগী ও আমাদের অভিজ্ঞতা**

গত দশ বছরের বেশি সময় ধরে এই রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি এই রোগীদের চিকিৎসা কেবল অ্যাসিডজনিত সমস্যা নয়, তার সঙ্গে রয়েছে মানসিক সমস্যা। সামাজিক অর্থনৈতিক পারিবারিক নানান জটিলতা মোকাবিলা ব্যতিরেকে এর সফল চিকিৎসা সম্ভব নয়। এঁদের প্রতি পরিবারের উদাসীনতাও বহু ক্ষেত্রে সফল চিকিৎসার প্রতিবন্ধক। অন্যদিকে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের অভাবে অধিকাংশ হাসপাতালে এঁদের চিকিৎসা হয় না। এমনকি দক্ষিণ ভারতের যে সব বিখ্যাত হাসপাতালে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সুচিকিৎসার আশায় ছুটে যান, সেখান থেকেও রোগী ফিরে আসেন। এমন কি সে সব হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার থেকেও রোগীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে, এটা আমরা দেখেছি। আশার কথা পশ্চিমবঙ্গে বসেই এ সমস্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের চিকিৎসায় আমরা সফল হয়েছি।

লেখক পরিচিতি : ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী, এমবিবিএস, ডিএনবি, এমসিএইচ, কার্ডিওথোরাসিক সার্জন। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

এবিপি আনন্দের অ্যাঙ্কর টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায়
চলে গিয়েছেন ২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে।

সন্দীপ্তা অন্যের জন্য ভাবতে এবং করতে জানতেন।
তাঁকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর এক উদ্যোগ

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্য–ভুবন

QUALITY is the way of life

PALSONS DRUGS

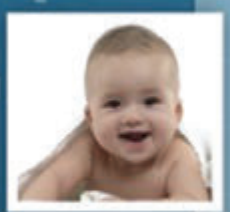

WHO-GMP
Certified Company

ISO 9001:2008
Certified Company

IDMA
Quality Excellence
Award Winner

PALSONS DRUGS International Tie-ups
For Indian Market

Belgium — AURIGA
France — BIODERMA
Spain — Aesthetic Dermal
Spain — SKIN TECH

PALSONS DRUGS PVT. LTD.
10/D/1, Ho-Chi-Minh Sarani
Kolkata - 700 071
Phone : 91-33-2282-3776/4277/4278
E-Mail : brandinfo@palsonsdrugs.com

www.palsonsdrugs.com

PALSONS DRUGS

মেয়েদের স্বাস্থ্য–ভুবন

কামদুনির মায়ের ঘুম নেই

রত্নাবলী রায়

কামদুনির ঘটনা এবং পরবর্তী প্রতিবাদ-আন্দোলন নিয়ে তো অনেক কথাই হচ্ছে, নানা চর্চা চলছে, কিন্তু নির্যাতিতার পরিবারের বিশেষত তার মায়ের মানসিক অবস্থা নিয়ে নামমাত্র কথাবার্তা হয়েছে। অথচ এঁদের মানসিক অবস্থার উপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল, কিন্তু উত্তেজনাকর খবর, চমক আর নিজস্ব মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে সমাজের মন থেকে বিষয়টি প্রায় হারিয়েই গিয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব বিষয় উঠে এসেছে, সেগুলোর গুরুত্বকে কোনও ভাবেই খাটো করছি না, কিন্তু মানুষগুলোর ব্যক্তিগত সমস্যা, সংকটকেও তার সঙ্গে মিলিয়ে, গুরুত্ব দিয়ে দেখার যথেষ্ট অবকাশ এখানে রয়েছে।

আমার এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অনিরুদ্ধ দেবের কাছে অনুরোধ এসেছিল, কামদুনির মেয়েটির পরিবারের কাছে গিয়ে তাঁদের অবস্থাটা দেখার জন্য।

দিনটা ১২ জুলাই। একজন আমাদের মধ্যমগ্রাম মোড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে আমাদের সঙ্গী হল চার পড়ুয়ার দল, তিনটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারা কামদুনিরই বাসিন্দা এবং নির্যাতিতার দাদার বন্ধু।

মেয়েটির বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে আমার ধারণাটা বদলাচ্ছিল। যেমন গ্রামের ছবি ভেবে এসেছিলাম, এটা তেমন নয়। বৃষ্টি পড়েছে, তাই রাস্তায় কাদাভরা ঠিকই, দু'পাশে ঘন সবুজ। ভেড়িও রয়েছে। কিন্তু মেয়েটির বাড়ির চারপাশের বাড়িগুলো মোটের ওপর পাকা। ওদের বাড়িটাও টালির বাড়ি, এক চিলতে বারান্দা, একটা ঘর, পিছনে রান্নাঘর। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, প্রবল দৈন্যদশা—এলাকাটা তেমন নয় একেবারেই। গ্রামে ঢোকার মুখে দেখলাম, একটা বাংলা চ্যানেলের রিপোর্টার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চিন্তায় পড়লাম। কারণ আমরা যে কাজে এসেছি, সেখানে সাংবাদিকরা থাকলে মুশকিল হবে। তবে আমরা যখন মেয়েটির বাড়ি ঢুকলাম, জানতে পারলাম, সাংবাদিকরা গিয়েছেন সব আদালতে, শুনানি কভার করতে, ফলে নিশ্চিন্ত হলাম।

চোখেরত লায় পুরুক ালি,ব.ক্ষ,এ লোমেলোচ ুল, পুরোপুরি ভেঙে যাওয়া একটা মানুষ—মেয়েটির মা। কেমন আছেন বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এ কান্না তো সে দিন থেকেই আর থামেনি। "... ওরা রাক্ষস। আমার মেয়েটাকে খেয়েছে। আমি ঘুমোতে পারি না, আমি ঘুমোইনি, গত ১ মাস ছয় দিন ধরে আমি ঘুমোইনি। যেদিন থেকে আমার মেয়েটা গেছে, আমি চোখের পাতা এক করতে পারি না। একটু শুই কি আবার উঠে বসে থাকি। ঘরের কোনও কাজ করতে পারি না, সব আমার জা করে, রান্না করে দেয় আমাকে খাইয়ে দেয়, স্নানও করিয়ে দেয়।" ... ঘুমোতে পারি না, ঘুম আসে না, শুনতে শুনতে একবার বললাম, "একটু ঘুমোতে পারলে কি একটু শান্তি পাবেন?" মাথা নাড়লেন। "..ওরা আমাকে বলে কেঁদো না, কেঁদো না, কাঁদলে কি মেয়ে ফিরে আসবে? ওর বাবার চোখে ছানি, পেটে আলসার, খুব অসুস্থ। সরকার আর জি কর থেকে ডাক্তার পাঠিয়েছিল। অ্যাম্বুল্যান্সে করে। ডাক্তার দেখল, হজমের ওষুধ দিল, ওষুধ খেয়ে এখন ভাল আছে।" আপনার স্বামী যদি আর জি করে দেখাতে যান, সঙ্গে কে যাবে? "কে আর যাবে, ও-ই যাবে।" তারপরেই আাবার প্রবল কান্না। "হায় ভগবান, ওদের গায়ে কি গন্ডারের চামড়া?" এই 'শক'টাই এখন তাঁর জীবনের, শরীরের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে যাওয়া একমাত্র বাস্তব, একমাত্র সত্য।

ঘরে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, অনেক দেবদেবী। জিজ্ঞেস করলাম, "ভগবানে বিশ্বাস আছে? ঠাকুরকে নিয়মিত জল দেন? প্রদীপ জ্বালান?" বললেন, "আমি না, আমার জা দেয়, কিন্তু ভগবানের কী দোষ? ভগবানকে দোষ দেওয়া ভুল হবে, উনি তো আমার মেয়েকে কেড়ে নেননি। ও তো রাস্তা পার হতে গিয়ে কোনও অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়নি। ওই রাক্ষসগুলো ওকে খেয়েছে।" এই অবস্থায় এ ভাবে ভাবা? অবাক হয়ে গেলাম। "এই যে আমার দুই ছেলে। ছোটটা ভাল মনে রাখতে পারে না। এই পড়ে এই ভোলে, এই বই থেকে পড়ল, আবার এই বুঝতেই পারল না। আমার মেয়েটার মতো ওর বুদ্ধি নেই।"

বাবা অন্তত দৃশ্যত সংযত, শরীরও কিছুটা ভাল মনে হল। যদিও বলছিলেন, পেটের সমস্যা, ছানির সমস্যা। জিজ্ঞেস করলাম, স্ত্রী যে রাতের পর রাত ঘুমোন না, তা নিয়ে কী ভাবছেন? উনি চুপ করে থাকলেন। তাঁর স্ত্রী বলছিলেন, স্বামী আর ছোট ছেলে রাতে একই ঘরে ঘুমোন আর তিনি জেগেই থাকেন। অনিরুদ্ধর চেম্বারে উনি কি স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন? বললেন, "যাব, ও যদি যেতে চায়।" সেই সময়েই মেয়েটির মা বলে উঠলেন, "আমিই তো ওকে চেক আপে নিয়ে যাই। ও আবার আমাকে কী নিয়ে যাবে? আমি কী বাইরে যেতে পারব? আমি এই চার দেওয়ালের বাইরে যেতে চাই। কিন্তু আমি পারব না, আমি এই ঘরের বাইরে যেতে পারব না। আমার ভয় করে, খুব ভয় করে, ওই দেওয়ালের পিছনে ওরা আমার মেয়েটাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আমাদের যেতে ঘণ্টা খানেক দেরি হলেই ওরা অন্ধকারে মেয়ের শরীরে পাথর বেঁধে পুকুরে ফেলে দিত। জানতেই পারতাম না কোনও দিন, আমার মেয়েটার কী হল, কোনও খবরই পেতাম না। মা আসছি, মা আসছি, তিন বার

বলে মেয়েটা সেদিন বাড়ি থেকে বেরোল, আর ফিরল না। আর কোনও দিন ওকে দেখতে পাব না।"

মেয়েটির দাদা-ভাইকে মোটের ওপর ভালই দেখলাম। বড়জন জিজ্ঞেস করল, "বাবাকে কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু, এক্সরে দেখলেন?" আমি বললাম যে, আমরা এসেছি তার মায়ের মানসিক অবস্থাটা দেখতে, বুঝতে। সে শুধু ঘাড় নাড়ল।

ছোট ভাইটা রোগা, ন্যাড়া মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল গজিয়েছে। বলল, "মা ঘুমোয় না। সব সময় কাঁদে। আমিও ভালভাবে ঘুমোতে পারি না। ভয় করে, আমাকে যদি কেউ মারতে আসে, দেখছেন তো আমার এই রোগাপটকা চেহারা, আমি তো কিছুই করতে পারব না। .. অনেক খাই, কিন্তু গায়ে লাগে না। সারাক্ষণ একটা কথাই ভাবি, সে দিন কেন দেরিতে পৌঁছলাম? ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারলে আমি তো সাক্ষী হতে পারতাম, আমার দিদি অন্তত বিচার পেত। আর পড়ব? পড়তে বসলেই তো দিদির কথা মনে হবে। ওই বিছানায় আমি আর দিদি পাশাপাশি বসে পড়তাম। আমার কোথাও আটকে গেলে দিদি বুঝিয়ে দিত। আবার পড়তাম। কিন্তু এখন আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে? কেউ নেই। আমার পড়তে ভাল লাগে না। খালি দিদির কথা মনে হয়। আমি ওর মুখে আগুন দিয়েছি। দাদা কী বুঝবে? ও তো মামাবাড়িতেই থাকে। কিন্তু এখন ও-ও ভয় পায়। আরেক জনের বাড়িতে শুতে যায়। ভিতর থেকে শক্ত করে দরজা বন্ধ করে রাখে। তারপরেও কোনও ফাঁক দেখলে সেটা যে ভাবে পারে, বন্ধ করার চেষ্টা করে। আমি চাই ওই গুন্ডাগুলো শাস্তি পাক, কিন্তু আমার দিদি তো আর ফিরে আসবে না।" এক প্রতিবেশি ধমক দেন, "চুপ কর, আমরা দোষীদের ফাঁসি চাই। ও তো কিছুই জানে না। বোকাহাবা একটা।"

যে পড়ুয়ারা আমাদের নিয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে আলোচনা হল। এক মাসের ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো দেওয়া হল। পরের ফলোআপ স্থানীয় ছেলেরাই করব। ফিরছি, পথে দু'বার সিআরপিএফ জওয়ানরা আটকাল। গাড়িতে ডাক্তারের স্টিকার দেখে অবশ্য ছেড়ে দিল। রাস্তায় বেশ কয়েকজন সিআরপিএফ জওয়ান দেখলাম। বেশ কিছু পোস্টার, দোষীদের শাস্তি চেয়ে একটা আবার দেখলাম স্কুলশিক্ষকের সাসপেনসন তুলতে চেয়ে।

ভাবনা

মাতৃত্ব নিয়ে আমরা গালভরা নানা কথা বলি, মাকে দেবীরূপে ভজনা করার একটা ঐতিহ্যও আছে। কিন্তু সবই লোকদেখানো, ওপর-ওপর। পিতৃতন্ত্র আমাদের মনকে এমন ভাবে তৈরি করেছে যে আমরা আমাদের মায়েদের দুর্দশা, বিপদই ভুলে যাই, অথচ আমাদের জন্যই মায়েরা কত সহ্য করেন। বাবার জন্য পরিবারের ভাবনা আছে, কিন্তু মায়ের কষ্ট, দুঃখের প্রতি উদাসীনতাব া প্রফড ৌপেক্ষা।ও ইঘ টনাম ায়েরম নে যগ ভীরঅ াঘাত দিয়েছে, যে ছাপ ফেলেছে, তাতে তাঁর ঘুম চলে গিয়েছে, তাই বলে যে তিনি যে পরিবারের অন্যদের কথা ভাবছেন না, তা তো নয়। মেয়ের জন্য শুধু তো নয়, স্বামী, ছেলের কথা ভেবে ভেবেও তাঁর ঘুম আসে না! কিন্তু মেয়ে বা বোনকে হারিয়েছেন বলে বাড়ির অন্যরা যে মাকে আগলাচ্ছেন বা বেশি দায়িত্ব নিচ্ছেন, তা তো নয়।

আর এই মানুষগুলোর মানসিক অবস্থা নিয়ে আমাদের অজ্ঞানতা তো সীমাহীন। মা যে বারবার বলছেন যে তাঁর ঘুম হচ্ছে না, না প্রতিবেশি, না সাংবাদিক, না সরকারি অফিসার— কারও সে দিকে নজর নেই। এই অবস্থা যে ভবিষ্যত মানসিক চরম ক্ষতির ইঙ্গিত হতে পারে, এবং মাকে কিছুটা ভাল করতে তাঁর ঘুম হওয়াটা দরকার, তা গ্রামবাসীদের তো ধারণার বাইরেই, অফিসারদেরও তা মাথায় আসেনি। না হলে সরকার বাবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তার পাঠান আর মায়ের জন্য ভাবেন না?

ছোট ভাইটারও মানসিক অবস্থা খারাপ, কিন্তু তার কথাও কেউ ভাবার নেই। অল্প বয়সে আঘাতের ধাক্কাটা কী ভাবে লাগে, তা বোঝার দায় কারও নেই, সেই প্রশিক্ষণও নেই। আমরা তো শুধু বলেই খালাস, "ও ছেলেমানুষ। কিছু বোঝে না।' আর এই ছেলেটিকে 'বোকাহাবা' ভাবা হয়, কথাগুলোয় তত যুক্তি নেই, গুছিয়ে বলতে পারে না। তাই তার কথা কেউ ভাবেও না। ছেলেটার বয়স ১৮, ক্লাস টেনে পড়ে। মাচো নয়। শরীর নিয়ে অত ভাবে না। সিক্স প্যাক নেই, মাসলটাসল নেই। বেশ দুর্বলই। দিদির মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করছে কিছুটা, ওর মধ্যে কিছুটা 'সেনসিটিভিটি' দেখলাম। তবে সেটাকেও আমরা মানসিক দুর্বলতা বলেই উড়িয়ে দিই।

একান্তে বসে শোক করবে, নিজেদের দুঃখ, যন্ত্রণার ভার নামানোর চেষ্টা করবে, সে সুযোগও এই পরিবার পায়নি। সম্ভবত কী ক্ষতি, কী শূন্যতা হল, তা ভাবার অবকাশও পায়নি। ন্যায়বিচার কী ভাবে পাওয়া যাবে, সেটাই তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, পাড়ার লোকের সম্মিলিত শক্তি, সংবাদমাধ্যম তাদের শক্তি জোগাচ্ছে। এক মাস ঘুমোতে না পারলে একটা মানুষের কী হয়, তা কেউ বুঝছেন না। ওই দিনটায় বাঁধা পড়ে আছেন সবাই, প্রতিশোধ চান সবাই। মা বললেন, অভিযুক্তদের সামনে আনা হলে তিনি তাদের কুচিকুচি করে কেটে নুন ছিটিয়ে দেবেন বঁটি বা দা দিয়ে কোপাবেন, তেমনএ কটাকি ছুভ াবলেন,ত ারপরেব ললেন,ব ড় পাথরদি য়েও দের থেঁতলে মারবেন।

শুধু ঘুমহীনতা তো নয়, মায়ের মনে এখন অন্য সব স্মৃতি মুছে গিয়ে শুধু ওই একটি দিনের স্মৃতি। সেই স্মৃতিই বারবার ফিরে আসছে মনের মধ্যে, এই ফ্ল্যাশব্যাকটা সাংঘাতিক। সঙ্গে রয়েছে প্রতিশোধের ইচ্ছে, রয়েছে নিজেকে দোষী করার প্রবণতা। মা বারবার বলছিলেন, "আমাকে তুলে নাও ঠাকুর, আমি কেন রয়ে গেলাম? আমাকে এই দিন দেখতে রেখে দিলে?"

কামদুনির মায়ের মতো মানুষের মানসিক শুশ্রূষার প্রাথমিক শর্তই কিন্তু নিঃশর্তে পাশে দাঁড়ানো, তাঁকে বা তাঁদের মানসিক ভাবে ধরে থাকা। তাঁদের অনুভূতিগুলো অবিকৃত ভাবে প্রকাশ হতে দেওয়া এবং তার আধার হওয়া। ধৈর্য ধরে শুনতে হবে তিনি বা তাঁরা কী বলতে চাইছেন। থামিয়ে দিলে চলবে না। এখানেই শেষ নয়, তাঁদের 'ইমোশনাল কাউন্সেলিং' করতে হবে, যাতে তাঁরা জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পান, সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারেন। এই মায়ের যেমন খিদে তৃষ্ণার বোধই নেই। যা খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, গলা দিয়ে নামাচ্ছেন।

'থ্রি হান্ড্রেড রামায়ণস, ফাইভ এগজাম্পলস অ্যান্ড থ্রি থটস অন ট্রানস্লেসন'—১৯৯১ সালের এই প্রবন্ধে অধ্যাপক এ কে রামানুজন রামায়ণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা রূপ সম্পর্কে লিখেছিলেন, তেমন কামদুনি গিয়ে নতুন নতুন সত্য আমার চোখের সামনে পরতে পরতে খুলে গেল। এটাই বলতে হয়, এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে এক সুতোয় গাঁথতে হবে একটাকে প্রাধান্য দেব, সেটা নিয়েই প্রচার করব, এটা ঠিক নয়। আর সেই কাজটা করতে পারলেই কামদুনির মায়ের যন্ত্রণাটা বোঝা যাবে, তাঁর চোখে ঘুম ফিরিয়ে দেওয়ারজ ন্যত খনঅ ামরাহ য়তো চষ্টাক রব,ত ঁারে ময়েকে তাঅ ার ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।

লেখক পরিচয় : রত্নাবলী রায় সমাজকর্মী ও মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের সংকঠক

গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা

'শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা' যে কেবল সাহিত্যের সত্য নয়, শব্দকে শরীরের আনাচে-কানাচে পাঠিয়ে সেখানকার 'ছবি' আমাদের সামনে নিয়ে আসে আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন। গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসাউন্ডের সাহায্যে আমরা অজাত শিশুটির সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। কত বার আল্ট্রাসাউন্ড করা দরকার, আর তার সুফলই বা কী? ভ্রূণের কোনও ক্ষতি হবে না তো? এই সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন **ডা. প্রদীপ সাহা।**

আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা তথা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এখন রোগ নির্ণয়ের অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্র। হাড়ের ভেতর ছাড়া শরীরের যে কোনও অংশের পরীক্ষায় এই প্রযুক্তি কাজে লাগে। আর ধাত্রীবিদ্যাতে এই পরীক্ষা খুব দরকারি, কেন না মায়ের পেটে রয়েছে যে ভ্রূণ বা শিশু, তাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না, এবং এক্স-রে জাতীয় রেডিয়েশন দিয়ে তার ছবি তুললে ভ্রূণের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। আল্ট্রাসাউন্ড আসার আগে গর্ভস্থ ভ্রূণের ব্যাপারে ডাক্তাররা খুব বেশি কিছু বলতে পারতেন না; হাত দিয়ে পেট টিপে আর পেটে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে কতটুকুই বা বলা যায়?

এখন অবস্থা অনেক বদলেছে। আশির দশকের প্রথমে, কলকাতায় সরকারি হাসপাতালে প্রথম আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন কিন্তু বসেছিল মেডিক্যাল কলেজের ইডেন হাসপাতালে। ইডেন হাসপাতালে কেবল স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার বিভাগ, তাই কলকাতার আল্ট্রাসাউন্ড ডায়াগোনোসিসের প্রথম পদক্ষেপ ধাত্রীবিদ্যার প্রয়োজনেই। আর আজকে মায়ের পেটে শিশুর অবস্থান খুঁটিয়ে দেখতে, তার রোগ থাকলে সেটা ধরতে, থ্রি-ডি ফোর-ডি পরীক্ষা, এবং আরও উন্নততর যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এক নতুন যুগে প্রবেশ করছি। এই ধরনের রোগ বা অবস্থান নির্ণয় করার প্রযুক্তি এখন মেডিসিনের একটা আলাদা শাখার অন্তর্গত— 'ফিটাল মেডিসিন'। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনার আগে দেখে নেওয়া দরকার এটা কতটা বিপদমুক্ত।

আল্ট্রাসাউণ্ডের বিপদ?

গত তিরিশ বছরে পাঁচ কোটির বেশি মহিলা গর্ভাবস্থায় এই পরীক্ষা করিয়েছেন এবং এই নিয়ে অনেক সমীক্ষাও হয়েছে। ভ্রূণের মৃত্যু, শিশুর অস্বাভাবিকতা, ১২ বছর বয়স অবধি শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, শিশুর কোনও রোগের প্রবণতা বাড়া বা শিশুর ক্যান্সারের হার বাড়া—এর কোনওটাই হতে দেখা যায়নি। এর প্রভাবে পরবর্তী জীবনে সেই সব শিশুর কোনও রকম মানসিক বা স্নায়ু রোগের সম্ভাবনা বাড়েনি। আল্ট্রাসাউন্ড শরীরে প্রবেশ করলে তাপ তৈরি হয়, তবে তাতে কোনও ক্ষতি হয় বলে এখনও জানা নেই। আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ্ আল্ট্রাসাউন্ড ইন্ মেডিসিন (AIUM)-এর মতে, বর্তমানে আল্ট্রাসাউন্ডের সুবিধেগুলো কোনও সম্ভাব্য বিপদের তুলনায় অনেকগুণ বেশি, তাই মা এবং তার ভ্রূণের ক্ষেত্রে আল্ট্রাসাউন্ড করা লাভজনক।

গর্ভাবস্থার ন'মাসের মধ্যে, দ্বিতীয় তিন মাস সময় বা দ্বিতীয় 'ট্রাইমেস্টার'-এ নিয়মমাফিক আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা। এখন কানাডা, ইংল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স, এবং জার্মানিতে প্রচলিত। ফ্রান্স এবং জার্মানিতে অন্তত দু'বার আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা হয়। প্রথম বার আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় দ্বিতীয় ট্রাইসেস্টারে, গর্ভাবস্থার ২২তম সপ্তাহে। আর দ্বিতীয় পরীক্ষাটি করা হয় তৃতীয় ট্রাইসেস্টারে বা গর্ভাবস্থার তিন মাসে, ৩১-৩৩ তম সপ্তাহে। অনেক জায়গায় প্রথম ট্রাইমেস্টারের শেষেও (১১-১৪ সপ্তাহে) আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা করাটা নিয়ম হিসেবে চালু হয়েছে। আবার আমেরিকায় এই পরীক্ষা হয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে, কখন করাবেন সেটা চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত।

আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা করায় কী লাভ হয়?

১। ভ্রূণের সঠিক বয়স জানা।
২। শিশুর জন্মানোর আগে বড় ধরনের দৈহিক বিকৃতি আবিষ্কার করা।
৩। একাধিক ভ্রূণের উপস্থিতি জানা।
৪। শিশুর ওজন জানা, এবং ওজন কম থাকলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।
৫। প্লাসেন্টা প্রিভিয়া (নিচের দিকে অবস্থিত গর্ভফুল, যেখানে গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ হয়) আগে আবিষ্কার করা।
৬। স্বাভাবিক গর্ভধারণ দেখা এবং মাকে আশ্বস্ত করা।
৭। অনেক সময় শিশুটি মাতৃগর্ভে থাকার যথাযথ সময় (৪০ সপ্তাহ) পেরিয়ে গেলেও মায়ের প্রসববেদনা শুরু হয় না—তখন ডাক্তারি উপায়ে প্রসব (বা সিজারিয়ান সেকশন) করানোর আগে আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে দেখা।

গর্ভাবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, প্রথম ট্রাইমেস্টার (প্রথম ১২ সপ্তাহ), দ্বিতীয় ট্রাইমেস্টার (১৩-২৮ সপ্তাহ) এবং তৃতীয় ট্রাইমেস্টার (২৯-৪০ সপ্তাহ)। প্রথম ট্রাইমেস্টারের শেষে (১১-১৪ সপ্তাহে) ভ্রূণের দৈহিক গঠন সম্বন্ধে খানিকটা জানা যায়। বিস্তারিত দৈহিক গঠন দেখার জন্য ২০-২২ সপ্তাহে আল্ট্রাসাউন্ড করা উচিত। শেষের দিকে ভ্রূণের পরিণতি লাভ, ভ্রূণথলিতে জলের পরিমাণ, এবং মায়ের সঙ্গে ভ্রূণের সংযোগকারী নাড়ি 'আমবিলিকাল কর্ড'-এর অবস্থান দেখা হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে আল্ট্রাসাউন্ড বেশি প্রয়োজন

১। ভ্রূণের বয়স
২। বয়স অনুপাতে ভ্রূণের আকার ও বৃদ্ধি
৩। গর্ভাবস্থায় মায়ের যোনি থেকে রক্তপাত
৪। ভ্রূণ জরায়ুতে কীভাবে আছে
৫। একাধিক ভ্রূণ আছে কি না (যমজ)
৬। ভ্রূণথলির রস নিয়ে পরীক্ষা করতে গেলে
৭। মায়ের রজঃস্রাব বন্ধ হয়েছে যতদিন, পেটে হাত দিয়ে বাচ্চার সাইজ তার থেকে অনেক কম বা বেশি
৮। শ্রোণিপ্রদেশে অস্বাভাবিক কিছু (টিউমার) সন্দেহ
৯। হাইডাটিফর্ম মোল সন্দেহ
১০। জরায়ু মুখে বিশেষ ইমপ্ল্যান্ট বসাতে হলে
১১। এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি সন্দেহ
১২। বিশেষ কোনও পদ্ধতির সঙ্গে
১৩। ভ্রূণ মৃত সন্দেহ
১৪। জরায়ুর গঠনগত ত্রুটি সন্দেহ
১৫। জরায়ুর ভিতরে কন্ট্রাসেপটিভ লুপের অবস্থান নির্ণয়
১৬। ডিম্বাশয়ে ফলিকল-গুলি কেমন আছে দেখতে
১৭। ভ্রূণের বায়ো-ফিজিক্যাল অবস্থা নিরূপণে
১৮। জন্মদানকালীন ঘটনাগুলো পরিদর্শনে
১৯। পলিহাইড্রামনিয়স বা অলিগোহাইড্রামনিয়স সন্দেহ
২০। গর্ভফুল খুলে (Abruptio placenta) যাওয়ার সন্দেহ
২১। ভ্রূণের মাথার দিকটা ওপরে থাকলে সেটা বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নীচের দিকে (স্বাভাবিক অবস্থান) করার পর দেখা
২২। গর্ভাবস্থার মেয়াদ পুরো হবার আগে জল ভাঙলে ভ্রূণ কতটা পরিণত ও মাথা নীচে (সঠিক অবস্থানে) আছে কি না দেখা
২৩। সিরাম আলফা কিটোপ্রোটিনের মাত্রা অস্বাভাবিক
২৪। ভ্রূণের গঠনগত ত্রুটি ধরা পড়ার পর সেটার অবস্থা যাচাই
২৫। নীচে অবস্থিত গর্ভফুল (Placenta previa) ধরার পর তার অবস্থান যাচাই।
২৬। আগে মা যদি জন্মগত বিকৃতিযুক্ত বাচ্চার জন্ম দিয়ে থাকেন
২৭। যে সব মা গর্ভাবস্থার প্রথমে ডাক্তার দেখাননি তার ভ্রূণের অবস্থা যাচাই
২৮। একাধিক (যমজ) বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রতিটা ভ্রূণের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা।

The Consensus Development Conference, sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development.

"U.S. Department of Health and Human Services : Diagnostic Ultrasound in Pregnancy. NIH Publication No. 84-667" থেকে সংগৃহীত। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের।

এত বড় তালিকা সাধারণত মানুষের পক্ষে খুঁটিয়ে পড়ে বোঝা শক্ত। কিন্তু এতে বোঝা যায় গর্ভাবস্থায় রুটিনমাফিক কিছু সময় অন্তর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করানো ছাড়া আর ঠিক কোন কোন কারণে এই পরীক্ষা যুক্তিসঙ্গত।

সত্যিকারের বিপদ

কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ডের বিপদ তার ত্রুটির থেকে আবির্ভাব হয়নি। বরঞ্চ ভ্রূণের অতি ক্ষুদ্র অংশ দেখতে পাওয়াকে অনেকে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। পর্দায় যতই করিনা বা ক্যাটরিনাকে দেখতে মন উৎসুক হোক, নিজের সংসারে মেয়ের পদার্পণ রুখতে ভ্রূণ হত্যা করতে অনেকে পিছপা হচ্ছে না। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কমেই চলেছে, বিশেষ করে পঞ্জাব এবং হরিয়ানায়। তাই ভারসাম্য ফেরাতে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সরকার PCPNDT (Preconception and prenatal diagnostic technique—prohibition of sex selection) আইন ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪-এ প্রণয়ন করেন, যা কি না ১৯৯৬-এ Regulation and prevention of misuse rule হিসাবে কড়াকড়িভাবে কার্যে পরিণত করছেন। আশা করা যায় মা, মেয়ের সমত্বে আবার উজ্জ্বল হবে সমাজ।

লেখাটায় ইতি টানার আগে কিছু অভিজ্ঞতা না বলে পারছি না। প্রায়ই মায়েরা বলেন, এত বার পরীক্ষা করাচ্ছি, বাচ্চার ক্ষতি হবে না তো? মাঝে শুনেছিলাম কোনও এক ভদ্রলোকের ধারণা আল্ট্রাসাউন্ড করায় শিশুর হার্টের প্রকোষ্ঠের মাঝে ফুটো হওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্যি বলতে এখনও এই পদ্ধতির কোনও ক্ষতির দিক দেখা যায়নি।

কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা শেষ। একটা মানবিক অভিজ্ঞতা বলি। মা যখন মেশিনের পর্দায় ভ্রূণকে নড়তে চড়তে দেখেন তখন তার মনের আনন্দ আমাদেরও ছুঁয়ে যায়।

লেখক পরিচিতি : ডা. প্রদীপ সাহা, এমবিবিএস, এমডি, রেডিওলজি ও ইমেজিং বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ADVERTISEMENT

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

পড়ুন ও পড়ান।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র।

কিশোরীদের মানসিক সমস্যার একটি রূপরেখা

তড়বড়-করে-কথা-কওয়া আপনার বাচ্চা মেয়েটি কয়েক দিনের মধ্যেই কি বড় মেজাজী আর খিটখিটে হয়ে পড়েছে? সময়ে খায় না, পড়তে বসে না, কেমন আনমনা, স্বপ্নের জগতে থাকে? স্কুল যাতায়াতের পথে ডুবে থাকে বন্ধুদের সঙ্গে গুজগুজ-ফুসফুসে? হঠাৎই কি আবার হেসে উঠে আপনার গলা জড়িয়ে ধরে গান গাইতে বলে? তারপর ডুবে যায় অন্য কোনও সুদূরে? 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'? ঠিক আছে, কিন্তু দেখুন সে 'নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে' নিয়েছে কি না— লিখছেন মনোবিদ **রুমঝুম ভট্টাচার্য।**

শৈশব শেষ ও যৌবন শুরু হওয়ার আগে যে মধ্যবর্তী পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন বাহিত হয়, সেই স্তরকে কৈশোর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বলে কৈশোর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশু যখন শৈশব কাটিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হতে চলেছে তখন শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক (emotional) ও সামাজিক দিক থেকে তার মধ্যে বিপুল পরিবর্তন হতে থাকে, আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে তাদের মধ্যে তৈরি হয় টানাপোড়েন। অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত ঘটে যাওয়া এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে তারা বিভিন্ন মানসিক সমস্যার শিকার হয়ে পড়ে। যদিও কিশোর বয়সের বৈশিষ্ট্যগুলো লিঙ্গনির্বিশেষে অনেক ক্ষেত্রেই এক, তবু কিশোরীদের কিছু বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। কিশোরীদের মানসিক সমস্যা প্রধানত আবেগজনিত। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা কিশোর বয়সের ধর্ম। অল্পে উত্তেজিত হয়ে পড়া এবং অ-সামাজিক ভাবে (socially unacceptable way) রাগ প্রকাশ করা এগুলো কিশোরী মেয়েদের সাধারণ সমস্যা। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা অসংযত ব্যবহার করে ফেলে। একটি মেয়ে হয়তো ছোট বেলায় শান্ত প্রকৃতির ছিল। এগারো-বারো বছর বয়স হওয়ার পর হঠাৎ দেখা গেল সে খুব ঘন ঘন উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, বা রেগে যাচ্ছে। আবার হাসিখুশি মেজাজে থাকতে থাকতে হঠাৎ করেই চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। পড়াশোনায় অমনোযোগিতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বাবা-মায়ের মনে এই সব পরিবর্তন সম্বন্ধে এক ধরনের অসহায়তা তৈরি হয়। এই অসহায়তা আসলে 'পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে' ধরনের চিন্তা থেকেই তৈরি হয়। তাঁরা বুঝতে পারেন না শান্ত প্রকৃতির মেয়েটি কেন এ ভাবে বদলে যাচ্ছে। তাঁদের জানা দরকার, কৈশোরের সমস্যাগুলো কী এবং সেই সমস্যাগুলো কখন বয়সোচিত সমস্যা বলে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। অর্থাৎ কৈশোরে যে সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন, সেই পরিবর্তনগুলো অস্বাভাবিক বলে চিহ্নিত করার মাপকাঠি তাঁদের জানা দরকার। তা হলে নিজের সন্তানের মধ্যে সেই সব পরিবর্তন লক্ষ্য করলে তার প্রকৃতি ও স্বাভাবিকত্ব বিচার করতে তাঁদের সুবিধা হবে। কিশোরী মেয়েদের কিছু আবেগজনিত ও মানসিক পরিবর্তন যা, স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্য করা যায় তা নীচে দেওয়া হল।

১। আবেগের প্রকৃতি (nature) ও তীব্রতা (intensity) এই দুইয়ের হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন, অনেক ক্ষেত্রেই যা আগের থেকে অনুমান করা যায় না (unpredictable)।

২। এনার্জি অপসারণের (release) তাগিদে হঠাৎ হঠাৎ আপাত অর্থহীন সক্রিয়তা দেখা যায় (outbursts of activity)।

৩। বড়দের মতো আচরণ করার প্রবণতা দেখা যায়, যাকে অনেক সময় 'অকালপক্কতা' বলে মনে হতে পারে।

৪। নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং সমালোচনা সহ্য করতে না পারা।

৫। তারা বিশ্বাস করে তাদের সমস্যা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা সবটাই একেবারে স্বতন্ত্র (unique)।

৬। নিজের একটা জগতে বাস করার প্রবণতা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বিষণ্ণতা লক্ষ্য করা যায়। একলা কান্নাকাটি করতে পারে। অতিরিক্ত খাওয়া বা কম খিদের প্রবণতা দেখা দেয়।

৭। বন্ধুপ্রীতি বাড়ে। বাবা-মায়ের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে ও একলা থাকতে ভালবাসে। স্বাধীনতা চায়। তার ফলে বাবা-মায়ের কথা বা

উপস্থিতি অসহ্য লাগে।

এই সব পরিবর্তন লক্ষ্য করলে বোঝা যায় অসংযত আবেগ হল কিশোর বয়সের মূল সমস্যা।

তা হলে কখন এই সমস্যাকে অস্বাভাবিক বলে গণ্য করা হবে? কিশোরবয়সী মেয়েদের কী কী মানসিক রোগ হতে পারে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে বলি।

কিশোরীদের মধ্যে যে সব মানসিক রোগ দেখা যায় তার মধ্যে মুড ডিসঅর্ডার (mood disorder) অন্যতম। তা ছাড়া কনভার্সন ডিসঅর্ডার (যাকে আগে হিস্টিরিয়া বলা হত), বিভিন্ন রকম ব্যক্তিত্বের সমস্যাজনিত রোগ, যেমন—স্কিজয়েড পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (Schizoid personality disorder) বা সেক্সুয়াল আইডেনটিটির সমস্যা দেখা দিতে পারে। খাওয়া-ঘটিত রোগ (Eating Disorder) কিশোরীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। অ্যানরেক্সিয়া নার্ভোসা ও বুলিমিয়া নার্ভোসা দুটি খাদ্যজনিত রোগ। প্রথম ক্ষেত্রে রোগীর মনে সব সময় ভয় কাজ করে যে তার বুঝি ওজন বেড়ে যাবে। সেই ভয়ে সে খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দেয় ও দ্রুত তার ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে নেমে যায় (underweight)। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো হয়। প্রতি দু'ঘন্টা অন্তর খেতে থাকা ও প্রচুর পরিমাণে খাওয়া এই রোগের বিশেষত্ব। আবার মুড ডিসঅর্ডারে রোগী বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা অতিরিক্ত উদ্বেগে ভুগতে থাকে। কখনও কখনও কিশোরীদের মধ্যে শুচিবাইগ্রস্ততা (obsessive compulsive disorder) দেখা যায়। অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়ায় ও আবেগপ্রবণতায় ভুগতে থাকায় কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা যায়।

কিন্তু এই সব মানসিক রোগ নির্ধারণ করার জন্য অবশ্যই মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। যদি দেখা যায় বিভিন্ন উপসর্গ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যাতে কিশোরী মেয়েটির স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে তবে অভিভাবকের উচিত সময় নষ্ট না করে অবিলম্বে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা। এই সমস্ত রোগের চিকিৎসা ওষুধ ও সাইকোথেরাপির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা না করা হলে ভবিষ্যতে এই সব সমস্যা বড় হয়ে উঠতে পারে।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ভুল সংশোধন

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকার বিগত সংখ্যা (অক্টোবর নভেম্বর ২০১৩) 'বিকল্প চিকিৎসা না চিকিৎসার বিকল্প?' প্রবন্ধে পৃষ্ঠা ৬-এ লেখা হয়েছে, ক্লোরিন-এর পারমাণবিক ভর ১৭। সেটা ঠিক নয়। ক্লোরিন-এর পারমাণবিক ভর ১৭ নয়, ৩৫, আরও ঠিকঠাক বললে ৩৫.৫। সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর ২৩, সেটা ঠিকই লেখা হয়েছে। খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর ৫৮.৫। ওই একই ভুলের ফলে সেটা লেখা হয়েছে ৪০। তার আগেও পৃষ্ঠা ৫-এ লেখা হয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর ৪০, এবং ৪০ গ্রাম খাবার নুনে অণুর সংখ্যা ৬.০২৩ x ১ এর পিঠে ২৩টা শূন্য। প্রকৃতপক্ষে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর ৫৮.৫ ও ৫৮.৫ গ্রাম খাবার নুনে অণুর সংখ্যা ৬.০২৩ x ১ এর পিঠে ২৩টা শূন্য।

এতে বক্তব্য-বিষয়ের কিছুমাত্র হেরফের ঘটে না, কিন্তু ভুল করাটা ভুলই। স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকা তার পাঠকদের কাছে এজন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছে।

ADVERTISEMENT

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

নবজাতকের খাদ্য-খাবার

দ্বিতীয় পাঠ

প্রথম খাবার

আমরা আগের পরিচ্ছেদে (স্বাস্থ্যের বৃত্তে অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যা) আলোচনা করে দেখেছি, শিশু জন্মানোর আগে থেকেই প্রকৃতি তার খাদ্যের ব্যবস্থা করে রাখে। প্রকৃতির নিয়মে শিশু জন্মাবে মায়ের জঠর থেকে। সেখানে তার সহায় এবং অবলম্বন মা এবং একমাত্র মা-ই। এখন আমরা হাসপাতাল বানিয়েছি, ডাক্তার আছে, ধাই মা আছে, কিন্তু সে সব মানুষের তৈরি, প্রকৃতির নয়। প্রকৃতি জানে এই জগতে শিশুর একমাত্র আশ্রয়দাত্রী মা। সেখানে পিতারও কোনও মূল্য নেই। কোনও ভূমিকা নেই। তাই মা-ই শিশুকে খাদ্য জোগাবে, গরম করে রাখবে, বুকে জড়িয়ে ধরে অভয় দেবে, নিরাপদে রাখবে। প্রকৃতি এই চায়। আমাদের হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স, আয়া আছে। তাদের ভূমিকা হওয়া উচিত প্রকৃতির নিয়মকে সহযোগিতা করা, তাকে পাল্টানো নয়—লিখছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস।**

শিশুর প্রথম এবং একমাত্র খাদ্য মায়ের দুধ। বুকের দুধের খনি প্রকৃতি বানিয়ে রেখেছে মাতৃস্তনে। সেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় দুধের অভাব হবার কথা নয়। মাতৃজঠরে বাইরের থেকে তাপমাত্রা বেশি। তাই বাইরে আসার সাথে সাথে শিশুর ঠান্ডা লাগে। বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে আবার আমাদের শরীরের তাপমাত্রা বেশি, শরীর তাই গরম থাকে। শিশু তাই চায়, মা তাকে জড়িয়ে রেখে গায়ের সাথে চেপে ধরুক, তাকে উষ্ণ রাখুক।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু হয় শিশুর। সব ইন্দ্রিয় আবার জন্মের সময় সম্পূর্ণ কর্মক্ষমও হয় না। আবছা চোখে শিশু দেখে

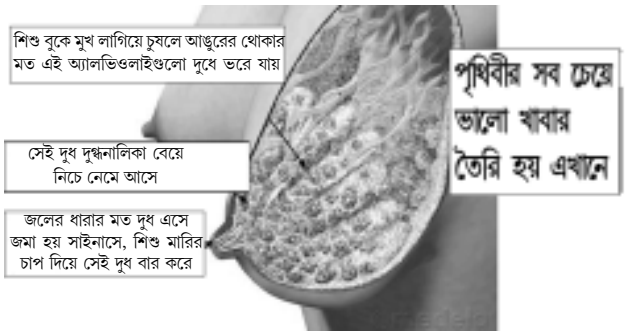

তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে। বেশি দূরের জিনিস সে দেখতে পায় না। তার কাছে থাকা লোকজনকে দেখে, মাকে দেখে। মায়ের গায়ের গন্ধ পায় সে। আর পায় বুকের দুধের গন্ধ। তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, তার খাদ্য। শ্বাস নিয়ে একটু ধাতস্থ হবার পর সে খুঁজতে থাকে তার খাদ্য। মুখ নাড়তে থাকে এদিক-সেদিক অসহায়ের মতো। সে স্তনবৃন্ত খোঁজে। তখন তার মুখের পাশে আঙুল নিলে সে সেদিকেই মুখ ঘোরায়, ভাবে দুধ পাবো। তার মুখ, জিভ, ঠোঁট সব এগিয়ে যায় সে দিকে। মায়ের স্তন তার মুখের কাছে নিলে স্তনবৃন্তের চারপাশের কালো হয়ে যাওয়া অ্যারিওলার ওপর তার নজর পড়ে, সে স্তনকে চিনতে পারে। তারপর হাঁ করে স্তনবৃন্ত সমেত পুরো অ্যারিওলাকেই মুখে পোরে। মাড়ি দিয়ে চাপ দেয়। যখন দুধ বের হয়, তখন তাকে ঠোঁট ও জিভ দিয়ে চুষে গলাধঃকরণ করে। মায়ের গায়ের সাথে তার গা লেগে থাকে—চামড়ার স্পর্শ হয়, সে নিশ্চিন্ত বোধ করে। মায়ের গায়ের গরমে তার গা গরম হয়। তার ঠান্ডা কমে। মায়ের কথা শোনে তার কান দিয়ে—সেই কথাতেই মাকে চেনে। এ ভাবেই চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয় তাকে তার মাকে চেনায়, তাকে খাবার জোগায়, বাঁচিয়ে রাখে।

প্রথম খাদ্যে কী পায় শিশু? তখন তো বুকে দুধ আসে না! তবে? এই প্রশ্ন সকল মা বাবার। মা প্রথম ২৪ ঘণ্টায় ৭-১২৩ মিলি প্রথম-দুধ বা কোলস্ট্রাম তৈরি করে। শিশু প্রতিবারে ৭-১৪ মিলি খায়, কাজেই যত অল্প দুধই তৈরি হোক, শিশুর পক্ষে সেটা যথেষ্ট। শিশু টেনে বুক ফাঁকা করে দিলে আবার নতুন দুধ তৈরি হয়, পক্ষান্তরে শিশু দুধ না টানলে স্বাভাবিক দুধ তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। দুধ তৈরি কম হয়।

শিশু জন্মানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে বুকের দুধ দিতে হবে। স্বাভাবিক ভাবে জন্মানো শিশুকে আধঘণ্টা পর, কিন্তু অবশ্যই এক ঘণ্টার মধ্যে, আর অপারেশান করে জন্মানো শিশুকে মা একটু ধাতস্থ হওয়ার পর, কিন্তু অবশ্যই চার ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ দিতে হবে। শিশুকে সঠিক ভাবে ধরে, শিশুর মুখ মায়ের স্তনের কাছে নিয়ে, স্তনবৃন্ত শিশুর মুখে দিতে হবে। মা শিশুকে গায়ে গায়ে মিশিয়ে ধরে থাকবে। শিশু নিজেই বুকের দুধ টেনে খাবে। তার জীবনের প্রথম খাদ্য। যদি শিশুর প্রথম টানতে অসুবিধা হয়, তবে মা একটু করে চাপ দিয়ে দুধ বের করে দেবে, দু'এক ফোঁটা যাই হোক, শিশু তার স্বাদ পাবে, তারপর নিজেই ঠিকমতো টেনে দুধ খাবে।

এই ঘটনাটা ছোট্ট। কিন্তু শিশুর এবং মায়ের জীবনে এর গুরুত্ব অসীম। শিশু স্পর্শে, গন্ধে, শব্দে তার মাকে চিনলো। প্রথম দুধ টানলো। দুধের স্বাদ পেল। কী ভাবে দুধ টানতে হয়, তার প্রত্যক্ষ শিক্ষা হল। মা-ও এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে তার আত্মজের সাথে একাত্ম হলেন। তাঁর স্বপ্ন পূরণ হল। সে সম্পূর্ণ হল।

নিপল কনফিউশন বা স্তনবৃন্ত ধাঁধাঁ

কিন্তু যদি বুকের দুধ না দেওয়া হয়, পরিবর্তে তাকে বোতলের দুধ বা জল

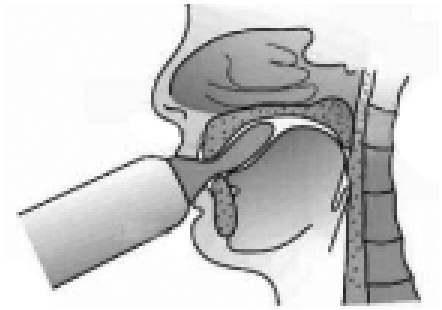

দেওয়া হয়, তবে কী হবে? তখন শিশু রবারের নিপল মুখে দিয়ে দুধ খাবে। কিন্তু বুক থেকে দুধ টানার প্রক্রিয়া এবং বোতল টেনে দুধ খাবার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। বোতল থেকে চুষে দুধ বের করতে হয়, সেখানে ঠোঁট এবং জিভের ভূমিকা প্রধান। মাড়ির কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু বুকের দুধ খেতে হলে শিশুকে প্রথম বুকের অ্যারিওলায় মাড়ি দিয়ে চেপে দুধ বের করতে হয়। তারপর সেই দুধ সাইনাসে এবং স্তনবৃন্তে আসার পর তাকে ঠোঁট এবং জিভ দিয়ে টেনে খেতে হয়। যে শিশুকে আগে বোতল ধরানো হল, রবারের নিপল দেওয়া হল তার মুখে—সে দুই ঠোঁট দিয়ে নিপলে চাপ দিয়ে জিভ দিয়ে চুষে তার প্রথম খাবার খেল। দুধ এলও সহজে, পরিশ্রম ছাড়া। বাইরের প্রথম খাবার সে খেল। জানল, এ ভাবেই খেতে হয়। খেতে হবে। এ ভাবেই তাকে চলতে হবে। বাঁচতে হবে। দুধ খেল, ঘুমাল, প্রস্রাব - পায়খানা করল। সবাই নিশ্চিন্তবোধ করল।

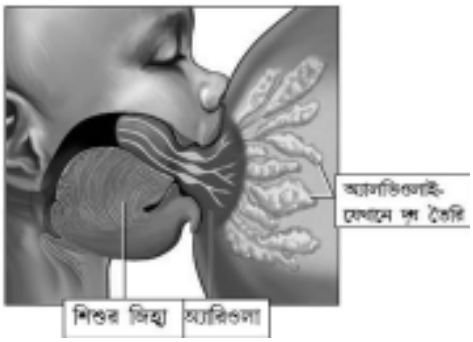

তারপর কোনও এক সময়ে অথবা এক দু'দিন পরে, হঠাৎ তার মুখে গুঁজে দেওয়া হল স্তনবৃন্ত। শিশু দেখল যে স্তনবৃন্ত সহজে মুখে ঢোকে না, কারণ আকারে তাও ছোট। আর দুই ঠোঁটের মাঝখানে তাকে চেপে ধরে জিভ দিয়ে চোষা যায় না। যদিও বা চোষা যায়, দুধ পাওয়া যায় না। কারণ, আমরা আগেই জেনেছি, স্তন থেকে দুধ বের করতে হলে প্রথমে মাড়ি দিয়ে অ্যারিওলায় চাপ দিতে হবে, তারপর স্তনবৃন্ত চুষে দুধ বের করতে হবে। শিশু সে সব শেখেনি। এক দু'ফোঁটা দুধ যদিও তার মুখে যায়, তা লবণাক্ত। তার স্বাদ আলাদা। শিশু পড়লো ধাঁধাঁয়। এ কী রে বাবা!

একটা উপায় সে শিখেছিল, যাতে সহজে খাবার পাওয়া যায়। আর এখন তাকে জোর করে অন্য খাবার দেওয়া হচ্ছে, যা সহজে পাওয়া যায় না, পরিশ্রম করে নিতে হয়। এই গোলকধাঁধায় পড়ে শিশু স্তনবৃন্ত থেকে দুধ টেনে বের করতে পারল না। সে দুধ না পেয়ে কাঁদলো, ঠেলে সরিয়ে দিল স্তন। ঠিকমত শিক্ষাও পেল না কী ভাবে দুধ খেতে হবে। এই ধাঁধার ইংরেজি নাম 'Nipple confusion', বাংলায় বলা যায় 'স্তনবৃন্ত ধাঁধা'। এর ফলস্বরূপ শিশু বুকের দুধ টানল না—স্তন পরিত্যাগ করল।

মা অভিযোগ করলেন—আমার বাচ্চা বুকের দুধ টানে না। আর আমরা আগেই জেনেছি—বুকের দুধ না টানলে দুধ তৈরিই হবে না। বরং জমা দুধও কমে যাবে। সব কিছুর নিট ফল—মায়ের বুকে দুধ না আসা। শিশু পরবর্তী সময়ে কি ভাবে দুধ খাবে, তা বুঝে উঠতে পারে না।

বিশেষ কিছু ক্ষেত্র

তবে এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার, অনেক সময়ে মায়ের স্তনের গঠনগত ত্রুটি থাকতে পারে, স্তনবৃন্ত ছোট বা স্তনের ভিতর ঢুকে থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে শিশুর দুধ খাওয়ার সমস্যা হয়। তখন অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে অবিলম্বে প্রতিকার করা উচিত। না হলে শিশু দুধ খাওয়া শিখবে না। আবার শিশুরও কিছু জন্মগত ত্রুটি থাকতে পারে— যেমন ওপরের ঠোঁট বা মাড়ি বা টাকরা কাটা থাকতে পারে (cleft lip or cleft palate)। সে অবস্থায় শিশু দুধ টানতে পারবে না। এ ছাড়া প্রিম্যাচিওর বা আগে জন্মানো শিশুর ক্ষেত্রে শিশুর দুধ খাওয়ার সহজাত প্রক্রিয়া (reflex) ঠিকমতো তৈরি হয় না, শিশু ঠিকমত দুধ টানতে বা গলাধঃকরণ করতে পারে না। যে সব শিশুর ওজন কম হয়, তাদের ক্ষেত্রেও দুধ টেনে খেতে অসুবিধা হতে পারে।

এই সব আগে জন্মানো বা কম ওজনের শিশুদের বুকের দুধ না পেলে এবং বাইরের খাবারও না খাওয়ালে সমস্যা তৈরি হয়। আমাদের শরীর বেঁচে থাকে প্রধানত গ্লুকোজ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। নবজাতকের দেহে সঞ্চিত গ্লুকোজ বা শক্তির ভাণ্ডার কম। তাই দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসে তাদের শরীরের গ্লুকোজ—তারা হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়। মায়ের বুকে পর্যাপ্ত দুধ আসতে প্রায় ৭২ ঘণ্টা সময় লাগে। তারপর দুর্বল শিশুও সহজে মায়ের দুধ টেনে খেতে পারবে। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে বাইরের খাবার দিতে হবে। এই সময় অন্য মায়ের বুকের দুধ পাওয়া গেলে তাই দেওয়াই ভাল। না হলে গ্লুকোজের জল দেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই বাটি চামচে করে। (বাটি চামচ ভাল করে ফুটিয়ে তারপর)। তা হলে আর Nipple confusion এর কোনও প্রশ্ন থাকবে না।

যে শিশুর জন্মগত ত্রুটি আছে, বা যাদের ওজন ১৮০০ গ্রামেরও কম, তারা হয়তো ঠিকমতো গিলে খেতে নাও পারতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের নাকে নল পরিয়ে নলের মাধ্যমে খাবার দিতে হতে পারে। যাদের ওজন ১২০০ গ্রামের কম, তাদের স্যালাইনের মাধ্যমে খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে খেতে পারছে।

যে সব সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex) শিশুকে খাবার খেতে সাহায্য করে

কিছু কিছু বিষয় শিশু নিজেই শিখে নেয়, একে বলে সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া। কিছু কিছু জন্মগত সহজাত প্রতিক্রিয়া আছে, যা শিশুকে খাবার খেতে সাহায্য করে। শিশু ঠিক সময়ে জন্মালে এই রিফ্লেক্স পরিপূর্ণ ভাবে তৈরি হয়, আগে জন্মালে এরা সম্পূর্ণ ভাবে তৈরি নাও হতে পারে। তখন খেতে অসুবিধা হয়। এই প্রতিবর্তক্রিয়াগুলো হল—

১। রুটিং রিফ্লেক্স (Rooting Reflex) : শিশুর ঠোঁটে, মুখের পাশে বা চিবুকে কিছু স্পর্শ করালে শিশু তার মুখ সে দিকে ঘুরিয়ে নেয়। সে ভাবে স্তনবৃন্তের কথা, এবং হাঁ করে গিলতে চায়। জন্মের তিন মাস পর্যন্ত এই প্রতিক্রিয়া থাকে। খাওয়ার পর দু'ঘণ্টা, বা শিশু যখন প্রস্রাব

করে, তখন এই প্রতিক্রিয়া থাকে না। চামচ বা কাপে খাওয়ালে এটা দেখা যায় না।

২। জিহ্বা প্রতিবর্তক্রিয়া (Tongue thrust reflex) : শিশুর ঠোঁট স্পর্শ করলে সে তার জিভকে সামনের দিকে বের করে দেয়। জন্মের পরে চার মাস পর্যন্ত এই প্রতিক্রিয়া থাকে।

৩। চোষা এবং গেলা প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Suck-swalloow pattern) : শিশুর নিচের ঠোঁট এবং টাকরা কোনও কিছু স্পর্শ করলে সে চোষে। এবং তারপর গিলতে শুরু করে। জন্মের পর থেকে বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত এটা বজায় থাকে।

৪। গেলা প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Swallowing Reflex) : দুধে যখন মুখ পূর্ণ হয়ে যায়, তখন শিশু গিলতে শুরু করে। জন্মের পর থেকে বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত এটা বজায় থাকে।

৫। গ্যাগ রিফ্লেক্স (Gag Reflex) : এই প্রতিবর্তক্রিয়া জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত থাকে। কোনও কিছু দিয়ে মুখের ভিতরের আলজিহ্বার কাছে অথবা জিভের পিছনের দিকে স্পর্শ করলে মুখের ভিতরের সব কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসে। অনেক সময় দুধ খাদ্যনালীতে না ঢুকে শ্বাসনালীতে ঢুকে যায়, তখন শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই রিফ্লেক্স সেটা আটকায় ও শিশুর শ্বাস বন্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।

৬। কামড়ানো প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Bite reflex) : শিশুর কচি মাড়িতে কিছু স্পর্শ করলে সে দুই মাড়ি দিয়ে চাপ দেয় বা কামড় দেয়। এই ভাবে চাপ দিয়ে সে অ্যারিওলা থেকে দুধ বের করে। তাই দুধ পাওয়ার উদ্দেশ্যে সেটা এটা করে।

শিশুকে কী ভাবে বুকে ধরবেন?

শিশুকে ঠিকমত না ধরতে পারলে বা মার অবস্থান ঠিক না থাকলে দুধ টানতে অসুবিধা হয়। মা শুয়ে বসে যে কোনও ভাবেই শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারে, কিন্তু প্রথম শর্ত মাকে সম্পূর্ণ ভাবে দুশ্চিন্তামুক্ত এবং নিশ্চিন্ত থাকতে হবে। মা অসহিষ্ণু হলে বা তাড়াহুড়ো করে দুশ্চিন্তা নিয়ে দুধ খাওয়াতে বসলে দুধ কম হবে। বসে খাওয়ালে মা সোজা হয়ে বসে পিঠে কিছু হেলান দিয়ে বসবে, কিন্তু তার নজর থাকবে শিশুর মুখের দিকে।

শিশুকে যতটা সম্ভব গায়ের সাথে মিশিয়ে ধরতে হবে, যাতে স্পর্শ ভাল হয়।

১। শিশুর মাথা এবং দেহ সোজা থাকবে।

২। শিশুকে মায়ের দিকে এমন ভাবে ঘুরিয়ে ধরতে হবে, যে শিশুর মুখ থাকবে স্তনের দিকে এবং শিশুর নাক থাকবে স্তনবৃন্তের বিপরীতে।

৩। শিশুর শরীর মায়ের পেট স্পর্শ করে থাকবে।

৪। শিশুর সমস্ত শরীরই ঠিক ভাবে ধরতে হবে, শুধু ঘাড়ের নিচে বা কাঁধকে উঁচু করে ধরে রাখলে হবে না।

৫। এমন ভাবে ধরতে হবে যাতে শিশুর চিবুক মায়ের স্তন স্পর্শ করে, শিশুর মুখ খোলা থাকে এবং স্তনের ওপরের অ্যারিওলা নিচের অংশ থেকে বেশি দেখা যায়।

৬। মায়ের হাত তার স্তনের নিচে থাকবে। বুড়ো আঙুল স্তনের ওপরের দিকে এবং তর্জনী স্তনের নীচের দিকে থাকবে। কিন্তু কোনও আঙুলই স্তনবৃন্তের খুব কাছে থাকবে না।

৭। শিশু মুখ না খুললে স্তনবৃন্ত দিয়ে শিশুর ঠোঁটের পাশে স্পর্শ করাতে হবে এবং যতক্ষণ না শিশুর মুখ সম্পূর্ণ খোলে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

এ ভাবেই শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক তৈরি হয় এবং শিশু স্বস্তি বোধ করে। শিশু নিশ্চিন্তে দুধ টানে এবং পান করে, মাও নিশ্চিন্ত হয়। কাজেই শিশুকে সঠিক ভাবে বুকে ধরা জানতে হবে।

ছোটর দাবি : কোনও শিশুই অবোধ অবলা নয়। তার বুদ্ধি বড়দের থেকে কোনও অংশে কম নয়। আমার আমাদের স্বার্থের কথা সব সময় ভাবি, স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে প্রতিবাদ করি, ক্ষুব্ধ হই। শিশুও তাই। তার স্বার্থ দুই কাঠা জমি কেনা নয়, সে শুধু তার খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে চায়। বুকের দুধের গন্ধে সে তার খাবার চিনেছে, অ্যারিওলার রঙ দেখে আর স্পর্শ করে সে মায়ের স্তন চিনেছে, মায়ের গায়ের গন্ধে আর কথার স্বরে সে মাকে চিনেছে। নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে সে তাই তার মাকে নিয়ে থাকতে চায়—তার আশ্রয়দাত্রী, তার খাদ্যের ভাণ্ডার। সময়মতো খাবার না পেলে তাই সে চিৎকার করে। খাবার সময় বাইরের কোনও শব্দ, গোলমাল সে সহ্য করতে চায় না, হয় চিৎকার করে কিংবা খাওয়া ছেড়ে দেয়। মা অমনি ডাক্তারের কাছে এসে অভিযোগ করে যে বাচ্চা দুধ ভাল খায় না। কিন্তু বাচ্চা তো চায়, মা তাকে নিয়ে সারাদিন একা একা নিরুপদ্রবে থাকুক। মাকেও সব কিছু বাদ দিয়ে তেমনি করেই থাকতে হবে। তবেই শিশুর বুকের দুধের অভাব হবে না।

লেখক পরিচিতি : ডা. স্বপন বিশ্বাস, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, এমডি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

With Best Compliments from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD

P-77, KALINDI HOUSING ESTATE
KOLKATA - 700089

গ্যাস, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর রোগ? না কি স্রেফ ‘অভ্যেস’?

গ্যাস, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর, বুকজ্বালা—এই সব উপসর্গে ভোগেন বহু মানুষ। ঠাট্টা করে অনেকে বলেন, এই সব যদি না থাকল তা হলে খাঁটি বাঙালি আর হলেন কোথায়? কিন্তু এ সব কি সত্যিই রোগ হিসাবে নেহাত অকুলীন, ঠাট্টা-তামাসার বিষয়? না কি এ সব উপসর্গকে পুষে রাখলে বিপদ বাড়ে? গাদাগুচ্ছের অ্যাসিড কমানোর বড়ি আর অ্যান্টাসিড গিলে রোগকে বশে রাখা যায়? প্রশ্নগুলোর উত্তর তেমন সহজ নয়—লিখছেন **ডা. সুজয় বালা।**

এক বন্ধু এই প্রবন্ধের অর্ধসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি দেখে পরামর্শ দিয়েছিলেন, লেখাটার নাম রাখ ‘‘সব রোগের সেরা বাঙালির এই গ্যাস-অম্বল’’। তা কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু ভেবে দেখলাম, পেটরোগা বলে বাঙালির যে খ্যাতি আছে, সেটা নিয়ে জনসমক্ষে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বাংলাভাষী রেগেমেগে হয়তো সেটা পড়বেনই না। তাই এটাকে ‘রোগ’ বলা কতটা উচিত, সেই প্রাথমিক এবং খানিক গুরুগম্ভীর ব্যাপারটা নিয়েই প্রশ্ন তুললাম প্রথমে। আশা করি, এতে পাঠককুল বিমুখ হবেন না।

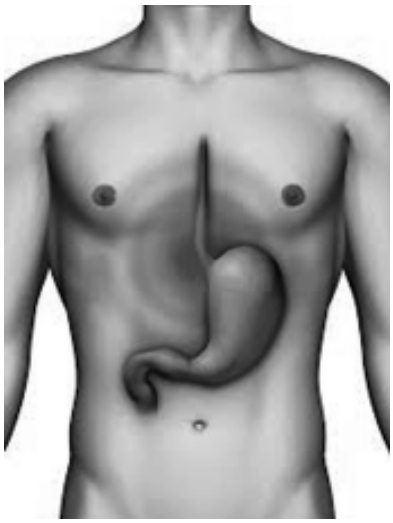

‘রোগ’ বা অসুখ জিনিসটা কী? ডাক্তারিবিদ্যার অভিধানে যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেটাকে একটু ভেঙে বলি। রোগ হলে কোনও মানুষের, বা কোনও এক গোষ্ঠীর মানুষের শরীর-মনের স্বাভাবিক ধর্ম, অভ্যাস বা আচরণ নেতিবাচকভাবে বদলে যাবে, এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা দেবে। কেবল কিছু উপসর্গ থাকলেই সেটাকে একটা ‘রোগ’ বলা যায় না। যতক্ষণ না সেটা ‘রোগী’-র জীবনযাপনের মান খারাপ করে না দিচ্ছে, ততক্ষণ সেটা একটা উপসর্গ-মাত্র। হয়তো বা কোনও কোনও উপসর্গ আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এত বেশি জড়িত, আমাদের এত পরিচিত একটা অভ্যাস, যে সেটা আর সমস্যা বলেই আমরা ভাবি না, রোগ বলে দেখি না। বরং জীবনেরই একটা অংশ যেন সেটা। আমাদের এখনকার ইঁদুর-দৌড়ের জীবনে গ্যাস, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর, বুকজ্বালা হল এই রকম—বেঁচে থাকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই রকম উপসর্গ নেই এমন মানুষ আপনি আশেপাশে খুঁজেই পাবেন না, আর মজার ব্যাপার হল, টিভি-র প্রতিটা বিজ্ঞাপন-বিরতিতে আপনি এমন সব ওষুধের সন্ধান পেয়ে যাবেন যেগুলো এই সব উপসর্গ চিরতরে নির্মূল করে দেওয়ার গ্যারান্টি দেয়। ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশন ছাড়া মুড়িমুড়কির মতো এই উপসর্গের নিরাময় বিক্রি হচ্ছে—জানেন তো, অ্যাসিড কমানোর ওষুধগুলো ওষুধ- বাজারে সবচেয়ে বেশি কাটতির মাল। কিন্তু তবুও এই উপসর্গগুলো হেলাফেলা করার ব্যাপার নয়।

কিন্তু আমরা কি গ্যাস, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর, বুকজ্বালা—এদের পাত্তা না দিয়ে দিব্যি থাকতে পারি? নাকি এই সব উপসর্গগুলো আজকে অবহেলা করলে কাল তা ডেকে আনতে পারে বড় বিপদ? ক্যানসারের সম্ভাবনা আছে না কি? এটা জানতে গেলে তো সমস্যাগুলোর ডাক্তারি দিক আর সামাজিক দিক দুটোই একটু বুঝে নিতে হবে। লেখাটা হয়তো ততটা সহজপাচ্য হবে না, তাই বিধিসম্মত সতর্কীকরণ—পড়তে পড়তে আপনার যদি অম্বল কি চোঁয়াঢেঁকুর হয়, তবে লেখককে দায়ী করবেন না।

আমাদের পৌষ্টিকনালী

আমাদের পৌষ্টিকনালী মোটের ওপর দু’টো ভাগে বিভক্ত। ওপরের দিক ও নীচের দিক। ওপরের দিকে রয়েছে খাদ্যনালী, যা মুখের পেছন থেকে আরম্ভ হয়ে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত। রয়েছে পাকস্থলী, যেখানে খাদ্য গিয়ে কিছুক্ষণ জমা থাকে এবং অ্যাসিড ও নানা উৎসেচকের সাহায্যে পরিপাক হয়। রয়েছে ডিওডিনাম, যেটা অন্ত্রের একেবারে প্রথম অংশ— পাকস্থলী থেকে অর্ধপাচিত খাদ্য এখানে আসে, এবং এখানেই পিত্তনালী দিয়ে পিত্তরস অন্ত্রের মধ্যে আসে। পৌষ্টিকতন্ত্রের নীচের দিক বলতে ডিওডিনাম বাদে বাকি ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্র—এদের কথা এখানে বিশেষ বলার প্রয়োজন নেই, কেন না গ্যাস, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর, বুকজ্বালা—এরা সবাই পৌষ্টিকতন্ত্রের ওপরের দিকে সঙ্গে জড়িত। বারংবার ‘গ্যাস, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর, বুকজ্বলা’ এতগুলো কথার বদলে ডাক্তারেরা বলেন ‘উর্ধ্ব-পৌষ্টিকতন্ত্রের উপসর্গ-সমূহ’, তবে আমাদের কাছে হয়তো সে কথাটা খটোমটো লাগবে। দু’টো মূল কারণে ‘উর্ধ্ব-পৌষ্টিকতন্ত্রের উপসর্গসমূহ’ হতে পারে। এক হল পাকস্থলী-ডিওডিনামের ঘা, বা পেপটিক আলসার রোগ (peptic ulcer disease [PUD]) দ্বিতীয় হল পাকস্থলী-খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী প্রবাহ-জনিত রোগ (gastroesophageal reflux disease [GERD])।

পাকস্থলী-খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী প্রবাহ-জনিত রোগ (gastroesophageal reflux disease [GERD])

ঘাবড়াবেন না, আমি অতি-পরিচিত গ্যাস, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর, বুকজ্বালা—এদের কথাই বলছি। খাদ্যনালী থেকে খাদ্য নেমে পাকস্থলীতে যায়, সাধারণ অবস্থায় পাকস্থলী থেকে খাদ্যের খাদ্যনালীতে উঠে আসার কথা নয়। আমাদের শরীরে একটা ব্যবস্থা আছে যেটা এই উল্টোমুখী খাদ্যপ্রবাহ রোধ করে। এই ব্যবস্থাটা কোনও কারণে ভেঙ্গে পড়লে পাকস্থলীর অ্যাসিড-সমেত অর্ধতরল অর্ধপাচিত খাদ্য উল্টোদিকে চলে আসে, এবং খাদ্যনালীর ভেতরের গায়ের আবরণীতে এসে লাগে। একেই বলে পাকস্থলী-খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী প্রবাহ-জনিত রোগ। মানসিক চাপ, ধূমপান, মদ্যপান—এগুলো সবই উল্টোপ্রবাহ আটকানোর ব্যবস্থাটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ফলে এই রোগটা হতে পারে। টিপিক্যাল ম্যাকডোনাল্ড-মার্কা পশ্চিমী খাদ্যাভ্যাসে থাকে বেশি ফ্যাট, যে কোনও জাঙ্ক ফুডেও তাই। এগুলো খেলে পাকস্থলী অনেকক্ষণ ধরে ভর্তি হয়ে ফুলে থাকে, আর সহজেই খাদ্যনালীর একেবারে নীচের অংশে পাকস্থলীর অর্ধপাচিত খাবার লেগে যায়। ফলে বুকজ্বালা করে। আমরা নিজের অজান্তেই মুখের লালারস গিলে ফেলে তখনকার মতো জ্বালা কমিয়ে নিই। লালা গিলতে গিয়ে খানিক বাতাসও গেলা হয়ে যায়, সেই বাতাসে পাকস্থলী আরও ফুলে যায়, ঢেকুর ওঠে, ওঠে চোঁয়া ঢেকুর—এই ভাবে খাদ্যনালীর নিচের অংশে বারবার পাকস্থলীর অ্যাসিড লেগে ক্ষতি হয়। দিনের পর দিন এই রকম চলতে থাকলে খাদ্যনালীর নিচের দিকের ভেতরকার আবরণীটি স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অ্যাসিড তখন আবরণীর নিচে ঢোকে, কোষের ক্ষতি করে, ফলে বুকজ্বালা ও ওপর পেটে ব্যথার অনুভূতি হয়। চোঁয়া ঢেকুর তো থাকেই। ওপর পেটে ব্যথা এই রোগে যেমন হয়, তেমনই পেপটিক আলসারেও হয়। কিন্তু বাতাস গিলে পেট ফুলে যাওয়া, ঢেকুর-চোঁয়া ঢেকুর ওঠা হল এই রোগের নির্দিষ্ট লক্ষণ।

এরকম চলতে থাকলে উল্টোমুখী খাদ্যপ্রবাহ রোধের ব্যবস্থাটা পুরো ভেঙে পড়ে, ফলে পাকস্থলীর অর্ধতরল খাবার আস্তে আস্তে খাদ্যনালী বেয়ে উঠে গলার কাছে এসে নিঃশ্বাসের নালীতে প্রবেশ করে, আমরা বুঝতেও পারি না। এর ফলে গলার স্বর-ভাঙা, অনেক দিন ধরে কাশি, বারবার শ্বাসনালীর সংক্রমণ, হাঁপানি, বুকে ব্যথা—এই সব হয়। খাদ্যনালীর

> “খাদ্যনালীর নীচের অংশে ক্যানসারের সম্ভাবনাও বাড়ে।”

নীচের অংশ বারংবার প্রদাহের ফলে শক্ত ও সরু হয়ে যায়, খেতে কষ্ট হয়। এবং এই অবস্থায় একবার পৌঁছে গেলে খাদ্যনালীর নীচের অংশে ক্যানসারের সম্ভাবনাও বাড়ে।

চিকিৎসা : প্রথমে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন, কাজ না হলে অস্ত্রোপচার।

(ক) **ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা :** পাকস্থলী থেকে অ্যাসিড বেরনো বন্ধ করার ওষুধ দিয়ে পাকস্থলী-খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী প্রবাহ-জনিত রোগের ব্যথা কমানো যায়, ঠিক পেপটিক আলসারের মতোই। প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, অর্থাৎ প্যান্টোপ্রাজোল, ওমিপ্রাজোল ইত্যাদি বুকজ্বালা ও চোঁয়া ঢেকুর কমিয়ে দেয়, আর এগুলো এইচ-২ অ্যান্টাগনিস্ট, অর্থাৎ র‍্যানিটিডিন, ফ্যামোটিডিন ইত্যাদির চেয়ে বেশি কার্যকর। এই উপসর্গ-নিয়ন্ত্রণ চালাতে গেলে সারা জীবন টানা প্যান্টোপ্রাজোল-ওমিপ্রাজোল জাতীয় ওষুধ খেতে হতে পারে। অ্যান্টাসিড (সাসপেনসন বা ট্যাবলেট) খুব অল্প সময়ের জন্য আরাম দেয়।

কিন্তু এই অ্যাসিড বেরনো বন্ধ করার ওষুধগুলোর বড় সীমাবদ্ধতা হল, উপসর্গ কমালেও এরা পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী খাবার আসার ব্যাপারটা আটকাতে পারে না। পাকস্থলী থেকে অর্ধপাচিত অর্ধতরল খাবার উঠে আসে, কিন্তু সেটাতে অ্যাসিড থাকে না; বরং সেটা ক্ষারধর্মী অর্ধতরল হয়ে যায়। পাকস্থলীর অর্ধপাচিত খাদ্যে ডিওডিনামের পিত্ত মিশে তা ক্ষারধর্মী হয়ে যায়। এতে খাদ্যনালীর নীচের দিকের ভেতরের আবরণীর ক্ষতি আটকায় না। বরং এখন মনে করা হয় যে ক্ষারধর্মী অর্ধতরলটি খাদ্যনালীর আবরণীর বেশি ক্ষতি করে— খাদ্যনালীর নীচের অংশে ঘা, শক্ত ও সরু হয়ে যাওয়া (stricture), এমনকী ক্যানসার—এ সবের সম্ভাবনা বাড়ে। পিত্ত-মেশানো ক্ষারধর্মী জিনিসটি খাদ্যনালীর কোষের জেনেটিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ায় বলে ভাবা হয়। আরেকটা সমস্যা হল, পাকস্থলীতে অ্যাসিড সাধারণভাবে খুব বেশি থাকে, আর ওই অ্যাসিডে জীবাণু বাঁচতে পারে না। আমরা আগেই দেখেছি, পাকস্থলীর অর্ধতরল খাবার আস্তে আস্তে খাদ্যনালী বেয়ে উঠে গলার কাছে এসে নিঃশ্বাসের নালীতে প্রবেশ করে, আমরা বুঝতেও পারি না, অথচ এর ফলে শ্বাসনালীর সংক্রমণ হয়। পাকস্থলীর অ্যাসিড যদি না থাকে, যদি

> “অ্যাসিড বেরনো বন্ধ করার ওষুধ দিয়ে টানা চিকিৎসা করার যে ব্যাপারটা খুব প্রচলিত, সেটা করা মোটেই উচিত নয়।”

সেখানে ক্ষারীয় অর্ধতরল থাকে, সেখানে জীবাণু অনেক বেশি সংখ্যায় থাকে। সেই অর্ধতরল নিঃশ্বাসের নালীতে প্রবেশ করলে অনেক বেশি জীবাণু ঢোকে। ফলে শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ অনেক বেশি হয়, নিউমোনিয়া হতে পারে। সুতরাং অ্যাসিড বেরনো বন্ধ করার ওষুধ দিয়ে টানা চিকিৎসা করার যে ব্যাপারটা খুব প্রচলিত, সেটা করা মোটেই উচিত নয়।

পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে যখন খাদ্য এগিয়ে যায়, সেটা এমনি-এমনি যায় না। পাকস্থলী হোক আর অন্ত্র, এই সব বিভিন্ন নলের আকৃতির অংশের দেওয়ালে মাংসপেশির আস্তরণ থাকে, আর সেই মাংসপেশিগুলো পর্যায়ক্রমে এইভাবে সংকুচিত - প্রসারিত হতে থাকে যে ভেতরকার খাদ্যমন্ড তার ঠেলায় এগিয়ে চলে। সিজাপ্রাইড বলে একটা ওষুধ আছে, বাজারে নানা নামে চলে। সেটা খেলে পৌষ্টিকনালীর ওপরের দিকে পেশিগুলো তাড়াতাড়ি কাজ করে, ফলে খাদ্যমন্ড চলার গতি দ্রুত হয়। খাদ্যনালীর নিচের অংশের মধ্যে খাদ্য দ্রুত যায়, তারপর পাকস্থলী থেকেও দ্রুত খাবার ডিওডিনামে চলে যায়। ফলে পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী খাবার কম আসে। আর লালা বেশি বেরোয়,

সেটাও খাদ্যনালীর প্রদাহ হবার সম্ভাবনা কমায়। সুতরাং এই ওষুধে খানিক কাজ হয়। কিন্তু এই গোত্রের নানা ওষুধ আছে, যেমন মেটোক্লোপ্রামাইড, বেথানেকল, ও ডোমপেরিডোন—তাদের কোনওটাই সিজাপ্রাইডের মতো কাজ করে বলে দেখা যায়নি।

(খ) **জীবনযাত্রার পরিবর্তন :** ধূমপান বন্ধ করা, চকোলেট, পিপারমিন্ট, পেঁয়াজ, ফ্যাটি তথা তৈলাক্ত খাদ্য না খাওয়া—এতে পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী খাবার আসা অনেক কমে যায়। নানা ধরনের মদে বেশি, এবং চা-কফি-কোল্ড ড্রিংকে তুলনায় একটু কম, বুকজ্বালা হয়। বড় খাবার খাওয়ার ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে শুয়ে পড়লে খাবার উল্টোমুখে আসার সম্ভাবনা বেশি। ঘুমোনোর সময়ে বিছানার মাথার দিকটা ৪ থেকে ৮ ইঞ্চি উঁচু করে রাখা দরকার; অথবা বাঁ-পাশে কাত হয়ে শুলেও চলবে।

জীবনযাত্রার এইসব পরিবর্তনের অনেকগুলো কেবলমাত্র হজমের জন্যই ভাল, তাই নয়, সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যই ভাল। সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হলে বুকজ্বালা ইত্যাদির চিকিৎসাতেও সুবিধা হয়।

সার্জারি : অস্ত্রোপচার করে পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী খাবার আসা আটকানো যায় (Antireflux surgery)। এটা রোগের স্থায়ী আরোগ্য — গঠনগত দিক দিয়ে এবং কাজের দিক দিয়েও। উপসর্গের উপশম তো হয়ই, খাদ্যনালীতে অ্যাসিড বা ক্ষারীয় কোনও রকম খাদ্য আসতে পারে না, ফলে খাদ্যনালী সরু হয়ে যাওয়া বা ক্যানসার—এ সবের সম্ভাবনাও থাকে না।

যেসব রোগী ওষুধ দিয়ে চিকিৎসায় পুরোপুরি ভাল আছেন, তাঁদের অস্ত্রোপচার করার দরকার নেই। কিন্তু যাঁদের ওষুধে আংশিক বা সাময়িক উপশম হচ্ছে, আর ওষুধ বন্ধ করলেই বুকজ্বালা ইত্যাদি ফিরে আসছে, তাঁদের অস্ত্রোপচার করাই ভাল। খাদ্যনালীর আলসার, বা প্রদাহের ফলে খাদ্যনালী সরু হয়ে যাওয়া—এসব যাঁদের হয়েছে, তাঁদের তো অপারেশন করানোই উচিত।

পেপটিক আলসার রোগ (পাকস্থলী-ডিওডিনামের ঘা)

পেপটিক আলসার হল পাকস্থলী বা ডিওডিনামের ভেতরের গায়ে ঘা। এদের ভেতরের দিকের আবরণীতে প্রদাহের ফলে আবরণীটি এক বা একাধিক স্থানে নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের চামড়ায় বড় ফোঁড়া হওয়ার পরে যেমন খানিকটা জায়গায় চামড়া কিছু দিন থাকেই না, দগদগে ঘা হয়ে যায়, এখানে ব্যাপারটা খানিকটা সেরকম। পাকস্থলী বা ডিওডিনামে অবশ্য ওইরকম ফোঁড়া কখনওই হয় না; কিন্তু ঘা-টা হয়। পাকস্থলীতে ঘা হলে বলি গ্যাস্ট্রিক আলসার, আর ডিওডিনামে ঘা হলে বলি ডিওডিনাল আলসার। দু'রকম আলসারেই ওপর পেটে ব্যথা হয়, কিন্তু কখনও-সখনও ব্যথা ছাড়াও আলসার হতে পারে, বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে। রোগীর ইতিহাস ভাল করে নিয়েও গ্যাস্ট্রিক আলসার না ডিওডিনাল আলসার খুব জোর দিয়ে আলাদা করে ধরা যায় না, কিন্তু কিছু উপসর্গ থেকে খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

ডিওডিনাল আলসার	গ্যাস্ট্রিক আলসার
◆ পেটের ওপরের দিকে মাঝে-মধ্যে ব্যথা। ওপর পেটের মাঝখানে, অথবা সামান্য ডানদিকে, কখনো-সখনো পিঠের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে	◆ পেটের ওপরের দিকে, বেশ যেন গভীরে, ব্যথা
◆ ব্যথার জায়গা অনেকটা নীচে, এমনকী নাভি পর্যন্ত নীচে হতে পারে	◆ খেলে ব্যথা বাড়ে, সাধারণত খাবার আধঘণ্টা মতো পরে
◆ খালিপেটে ব্যথা হয়, কিছু খেলে ব্যথা কমে	◆ রোগী খেতে চায় না, খেলেও কম করে খায়
◆ ব্যথায় রাতের ঘুম ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু প্রবল ব্যথা সাধারণত হয় না—বড় ধরনের জটিলতা থাকলে হতে পারে।	◆ ডিওডিনাল আলসার-এর তুলনায় ব্যথা বেশিক্ষণ থাকে ◆ ডিওডিনাল আলসার-এর তুলনায় ব্যথা বেশি হয়

সাধারণ অবস্থায় পাকস্থলীর কিছু কোষ থেকে অ্যাসিড বের হয়, সেটা ছাড়া খাদ্য হজম অসম্ভব। কিন্তু পাকস্থলী নিজেই তো একটা মাংসের থলি, সেটা কেন 'হজম' হয়ে যায় না? কারণ হল, পাকস্থলীর ভেতরকার যে আবরণী, সেটা নিজেকে অ্যাসিড থেকে রক্ষা করতে পারে। এই আবরণী-পর্দার সুরক্ষা-ক্ষমতা আর অ্যাসিডিটির মাত্রা—এ দু'য়ের মধ্যে একটা সাম্য থাকে। মানসিক চাপ, ধূমপান, মদ্যপান, অ্যাসপিরিন-জাতীয় ব্যথানাশক (NSAID গোত্রের ওষুধ বলে ডাক্তারদের কাছে যারা পরিচিত)—এরা সবাই আবরণী-পর্দার সুরক্ষা-ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে আলসার হবার সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু কিছু বছর আগে হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি নামে একটা জীবাণুকে পেপটিক আলসার-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে ধরা গেছে, এবং তার ফলে এই রোগের চিকিৎসার অনেক বদল হয়েছে। এই জীবাণুটি পাকস্থলীর ভেতর দিকের আবরণী-পর্দার কোষে বা তার তলায় থাকে, তাই পাকস্থলীর অ্যাসিড তার ক্ষতি করতে পারে না; অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করেও সহজে জীবাণুটিকে মারা যায় না। এই জীবাণু একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ তৈরি করে, ফলে আবরণী-পর্দা জায়গায় জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ছিঁড়ে যায়, আলসার তৈরি হয়। সেখান দিয়ে পাকস্থলীর অ্যাসিড আবরণী পর্দার নিচে ঢোকে। তার তলার কোষগুলোর তো কোনও অ্যাসিড আটকানোর ক্ষমতা নেই, সেগুলো তাই মারা যায়। ফলে বেদনা-বহনকারী স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়, পেটে ব্যথা হয়, সঙ্গে বুকজ্বালা। বমির সঙ্গে কালো রক্ত পড়া ও আলকাতরার মতো কালো পায়খানা হতে পারে। খুব বেশি ক্ষত হলে পাকস্থলীর দেওয়াল পুরোটাই ফুটো হয়ে যেতে পারে। সেটাতে আচমকা ভয়ানক পেটব্যথা হয়, আর কালো রক্ত-বমি ও কালো পায়খানা হতে পারে। এটা একটা ইমারজেন্সি ব্যাপার।

পাকস্থলীর দেওয়াল ফুটো হবার মতো ঘটনা এখন, বিশেষ করে র‍্যানিটিডিন-জাতীয় ওষুধগুলো ব্যাপক প্রচলনের পর থেকে, আর তত

বেশি ঘটে না। কিন্তু বহুদিন ধরে আলসার চলতে চলতে পাকস্থলীর অ্যাসিড তৈরি করার কোষগুলোই বিগড়ে গিয়ে অ্যাসিড বেরোনো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একে বলে অ্যাট্রোফিক গ্যাস্ট্রাইটিস। অ্যাসিড না বেরোলে হজম ঠিকমত হবে না, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু আবরণী-পর্দার ক্ষতি হতে হতে ক্যানসার হবার সম্ভাবনাও বাড়ে। গ্যাস্ট্রিক আলসার রোগীদের পাকস্থলীতে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা অন্য সবার তুলনায় তিনগুণেরও বেশি। বারবার বমির সঙ্গে কালো রক্ত পড়া বা আলকাতরার মত কালো পায়খানা, রক্তাল্পতা, অল্প খিদে, অকারণ ওজন-হ্রাস, খাবার গিলতে অসুবিধা বা ব্যথা বেড়ে চলা, বারবার বমি হওয়া—এগুলো হলে পাকস্থলীতে ক্যানসার হয়েছে কি না, সেটা খুব গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

চিকিৎসা : অ্যাসিড কমানোর ওষুধ দিয়ে ব্যথা কমানো যায়, তার সঙ্গে রোগের ভবিষ্যৎ বিপদও কমে। আগে আমাদের হাতে ওষুধ বলতে কেবল অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট আর সাসপেনসনই ছিল। তারপর এল 'এইচ-২ অ্যান্টাগনিস্ট', অর্থাৎ র‍্যানিটিডিন, ফ্যামোটিডিন ইত্যাদি, এবং তারপর প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, অর্থাৎ প্যান্টোপ্রাজোল, ওমিপ্রাজোল ইত্যাদি। এগুলো পাকস্থলী থেকে অ্যাসিড বেরনো কমিয়ে দেয়। কিন্তু হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি জীবাণুকে মেরে ফেলতে না পারলে সে জীবাণু পাকস্থলীর পর্দার ক্ষতি করে চলে, র‍্যানিটিডিন-ওমিপ্রাজোল ইত্যাদি দিয়ে অ্যাসিড কমানোর জন্য ব্যথা অবশ্য হয় না।

নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টিবায়োটিকের ১০ থেকে ১৪ দিনের কোর্স করলে হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি জীবাণু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্মূল হয়ে যায়। পৌষ্টিকতন্ত্রের ওপরের দিকের এন্ডোস্কোপি করে পেপটিক আলসার রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করা ভাল, আর এন্ডোস্কোপি করার সময়ে আলসারের ধার থেকে বায়োপ্সি নেওয়া উচিত, যাতে ক্যানসার না থাকলে সেটা নথিভুক্ত করা যায়। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি নির্মূল করার প্রচেষ্টা করার ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পরে আর একবার এন্ডোস্কোপি করে দেখা উচিত ঘা সারল কি না। র‍্যানিটিডিন, প্যান্টোপ্রাজোল ইত্যাদি অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণের ওষুধ হাতে আসার পরে পাকস্থলীর দেওয়াল ফুটো হবার মতো ঘটনা তত ঘটে না, কিন্তু ঘটলে তো ইমার্জেন্সি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার করতে হবেই।

সমস্যার সামাজিক দিক

পেপটিক আলসার হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি জীবাণু থেকে হয়, এবং এটা একজন মানুষের শরীর থেকে আরেকজন মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়িতে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব ও ঠাসাঠাসি করে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি না মানা ও সে ব্যাপারে চেতনার অভাব, দূষিত খাদ্য ও জল, এই রোগ আছে এমন মানুষের বমি ইত্যাদির সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা—এসবে রোগ ছড়ায়। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে সেটাই হচ্ছে। এই সব সামাজিক সমস্যার সমাধানে না এগিয়ে পেপটিক আলসার রোগীকে সারিয়ে তোলা গেলেও দেশে রোগের প্রকোপ কমানো শক্ত, কেন না পুনঃসংক্রমণ আটকানো যাবে না।

বিগত শতকের সাতের দশকের মাঝামাঝি থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 'পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী খাবার আসা রোগ'-এর (GERD) সঙ্গে জড়িত খাদ্যনালীর ক্যানসারের সংখ্যা বেড়েছে। সে দেশে পুরুষের মধ্যে কুড়ি বছরে (১৯৭৪ থেকে ১৯৯৪) এই রোগ বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ। এখন সে দেশে খাদ্যনালীর ক্যানসারের শতকরা ৮৬ ভাগ হয় নিচের এক তৃতীয়াংশে, পাকস্থলীর সংলগ্ন অঞ্চলে। ফুসফুস-ক্যানসার (ধূমপানের ফসল) আর ত্বকের মেলানোমা নামক ক্যানসার (রোদ আর ওজোন হল এর ফসল) — এ দু'টো বাদ দিলে দেহের অন্য যে কোনও অংশের তুলনায় বেশি দ্রুতগতিতে বাড়ছে খাদ্যনালীর নিচের অংশে আর পাকস্থলীর ওপরের অংশে ক্যানসারের হার।

তিন দশকে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। কোল্ড ড্রিংক তো ছিলই, মদের প্রচলন বেড়েছে। আর বড়-পুঁজির ফুড-চেইন ম্যাকডোনাল্ড, ডমিনো'স, পিজা হাট, কেএফসি, কোকাকোলা তাদের অস্বাস্থ্যকর খাবার, জাঙ্ক ফুড, আমাদের দেশ-সহ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। তার পাশাপাশি দেশি পুঁজি এদের অনুকরণ-অনুসরণ করে স্থানীয় ফুড-চেন তৈরি করছে, যাদের খাদ্য বহুজাতিক ফুড-চেনের খাবারের মতোই অস্বাস্থ্যকর। ভারতে যেখানে বা যাঁদের মধ্যে পশ্চিমী কালচার ছড়িয়েছে, এই রোগের পরিসংখ্যান সেখানে আমেরিকার চাইতে আলাদা কিছু হওয়ার কথা নয়।

এক জটিল অবস্থা। আমরা অনেকেই জানি এই খাবার ক্ষতিকর, কিন্তু পুষ্টিমূল্যের চাইতে গ্ল্যামার-মূল্য আমাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করছে। পশ্চিমী কালচার আর জীবনযাপন নির্বিচারে আমদানি করছি আমরা, নতুন 'সভ্যতা' আমরা কতটা আত্মীকৃত করতে পেরেছি, তার ওপরে আমাদের সামাজিক সম্মান নির্ভর করছে। এ এক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। মরীচিকার পেছনে ছোটা দিশাহারা উন্মাদের মতো আমরাও নিজেদের জীবনের মূল্যে চুকিয়ে দিচ্ছি পশ্চিমী-সভ্য হবার দাম। আমদানি করা পশ্চিমী সভ্যতা এক ছদ্ম-অ্যারিস্ট্রোক্র্যাসির ধারণা তৈরি করছে। সমাজের ওপরতলার মানুষ একবার সেই ভাবমূর্তির সামনে নিজের চিন্তাশক্তি বিসর্জন দিলে সেই ধারণা ছড়িয়ে পড়ছে জনারণ্যে। মানুষ আর নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিচ্ছেন না, চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে নিজের অভ্যাস, সংস্কৃতি, খাদ্যাখাদ্য ঠিক করছেন।

যদি বলি পেপটিক আলসার আর খাদ্যনালীতে উল্টোমুখী খাবার আসার রোগ, এরা হল চিকিৎসা বিজ্ঞান আর সমাজ বিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়ার জাজ্বল্যমান উদাহরণ, খুব ভুল হবে? আর সমাজের ব্যাধি, চিন্তার দৈন্য, অর্থনৈতিক কাঠামো—এসবের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে যে রোগ, তাকে খালি চিকিৎসাবিদ্যা দিয়ে ঠেকানো সম্ভব কি? রোগের মূল উৎপাটন করতে গেলে ডাক্তারের একার সাধ্যে কুলোবে কি?

লেখক পরিচিতি : ডা. সুজয় বালা, এমবিবিএস, এমএস, বর্তমানে ক্যানসার সার্জারির উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

ADVERTISEMENT

পরিপ্রশ্ন
সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রাপ্তিস্থান : কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল :বুকমার্ক, বইচিত্র, পাতিরাম
বিবাদি বাগ অঞ্চল : ইমা বুক স্টল, বেকার বুক স্টল, সুনীলদার বইয়ের দোকান (বিধাননগর) প্রগ্রেসিভ বুক স্টল (রাসবিহারী মোড়) এবং বিভিন্ন রেল স্টেশন বুক স্টল ● ইমেল: bach_datani@hotmail.com

ঋদ্ধিমানের জীবনযাপন

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

ছোটবেলা থেকে ভাবতাম, আমি কোনও দিন কোনও খারাপ কাজ বা অন্যায় করিনি, কাজেই ঈশ্বর আমার মঙ্গল করবেন। বহু দিন পর্যন্ত মনে হতো ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে আমার ওপর। কিন্তু সেই ধারণা হঠাৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল যে দিন নিউরোলজিস্টের মুখে শুনলাম আমার বড় ছেলে ঋদ্ধিমানের একটি জটিল নার্ভের রোগ হয়েছে, যার নাম অ্যাড্রিনোলিউকোডেস্ট্রফি (Adrenoleukodestrophy-ALD)। এটা একটা 'ডিজেনারেটিং ডিজিজ' এবং 'লস্ট কেস'। পরে জেনেছি, এই রোগে নার্ভের মায়োলিন আবরণটায় saturated very long chain fatty acid (VLCFA) জমে ও oxidation এর ফলে ভেঙে যায় অর্থাৎ ডিমায়োলিনেশন হয়। আমাদের শরীরের কোষে থাকা অঙ্গাণু পারক্সিজোমে অনেক উৎসেচক থাকে। উৎসেচক প্রোটিন দিয়ে তৈরি যা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। জিনঘটিত ত্রুটির জন্যে যদি কোনও উৎসেচক তৈরি না হয়, তা হলেই 'অ্যাবনরম্যালিটি' দেখা দেয়। বিশেষ করে ব্রেন সেল, নার্ভ সেল, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে Saturated VLCFA জমে যায়। ফলে ওই সব অঞ্চলের কাজ ব্যাহত হয়। প্রথমে ঋদ্ধিমানের 'অপটিক রিজিয়নে' এই ভাঙনটি ঘটে। ফলে প্রথমেই ওর দৃষ্টিটা চলে যেতে থাকে। তখন ওর মাত্র ন'বছর বয়স। একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ে। অমন প্রাণবন্ত ছেলে — যে ঘুড়ি ওড়ায়, ক্রিকেট খেলে, গল্পের বই পড়ে, কবিতা লেখে— তাকে আমরা কী ভাবে বলি— তোমার সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। বলতে পারিনি। বলেছিলাম— তোমার একটা নার্ভের অসুখ হয়েছে, চিকিৎসা করালে ধীরে ধীরে সেরে যাবে। পরবর্তীকালে শুনেছি ওকে সত্যি কথাটা বলা উচিত ছিল। কারণ দীর্ঘদিন ধরে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেও আজ যখন ও বুঝতে পারছে, ও আর কোনও দিন ভাল হবে না, ওর disability ক্রমশঃ বেড়েই যাবে তখন ওর একটাই কথা— ''আমাকে মেরে ফেলো, আমি আর বাঁচতে চাই না।''

গর্ভাবস্থায় অসাবধানতা ?

পরবর্তীকালে আমি একটা বইতে পড়েছি যে, বংশগত কিছু রোগের ক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বাদের সব দিক থেকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। আমার প্রশ্ন — কোনও প্রিকশন কি এই বংশগত রোগগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারে? কারণ এখন তো শুনি ক্যানসার থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস, টি.বি., হাঁপানি, হাইব্লাড প্রেশার, বাত ইত্যাদি বহু রোগই বংশগত। আসলে আমার প্রথম সন্তানের বেলা আমি প্রায়ই জ্বরে ভুগেছি। আমার স্বনামধন্য গায়নোকোলজিস্টকে বলতাম সে কথা। কিন্তু উনি আমার কথায় গুরুত্ব দেননি। পরে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে আমার প্রবল জ্বর হয়, আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। তখন আমাকে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়। এরপর ইউরিন কালচার করে (যা ডাক্তাররা আগে করতে বলেননি) ধরা পড়লো E.coli। সেনসিটিভিটি টেস্টে কড়া একটি অ্যান্টিবায়োটিকের নাম এল। গায়নোকোলজিস্টকে জিজ্ঞাসা করলাম— এই ওষুধটা বাচ্চার (তখন Foetus এর বয়স ৬ মাস) কোনও ক্ষতি করবে না তো? উনি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন— হ্যাঁ ক্ষতি করবে। কিন্তু না খেলে আরও বেশি ক্ষতি হবে। অন্য একজন গায়নোকোলজিস্ট উপদেশ দিয়েছিলেন— এ সব ক্ষেত্রে 'অ্যাবনরম্যাল চাইল্ড' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অ্যাডভান্সড স্টেজ না হলে আমরা অ্যাবরশন করার কথা বলতাম। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—ওই স্টেজে অ্যাবরশন কী কী ক্ষতি করতে পারে? বর্তমানে কোনও নিরাপদ চিকিৎসাব্যবস্থা হয়েছে কি না, জানতে পারলে কিছু মা-বাবা হয়তো উপকৃত হবেন। এরপর সেই গায়নোকোলজিস্টের হাতে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ একটি বাচ্চার জন্ম হল, আমার স্বামী প্রচুর ফুল-মিষ্টি দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। উনি বললেন, বাচ্চার ওজনটা খুবই কম (2kg 250 gm), কাজেই ওকে শুধু মায়ের দুধ খাইয়ে মানুষ করতে হবে এবং খুব যত্ন নিতে হবে। সব রকম চেষ্টাই করলাম। কিন্তু সে বেচারা মায়ের দুধটুকু টানবার শক্তিটুকুও পেত না। অথচ ক্ষিদেয় প্রচণ্ড কাঁদতো। Lactogen 1, 2, 3 খেয়েই সে বড় হয়ে উঠলো। এরপর তার সব কিছুই স্বাভাবিক ছিল, শুধু একটু রোগা। ওর যখন চার বছর বয়স তখন ওর একটি ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান ভাইয়ের (3.5 Kg ওজন) জন্ম হল। এবার আর আমি ডাক্তারদের ওপর নির্ভর করিনি; ভগবানের হাতেও ছেড়ে দিইনি আমার ভাগ্য। প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে প্রচুর জল এবং জলীয় জিনিস (গ্লুকোজের জল, দুধ, কমপ্ল্যান ইত্যাদি) খেয়েছি। প্রোটিন জাতীয় জিনিসও (মাছ ভাজা, ডিমসিদ্ধ) খেতাম। পরিশ্রমও প্রচুর করেছি কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে এবার আর E.Coli হতে দেব না। কিন্তু সেই সময় আমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক ক্রুর হাস্যে তাঁর আঙুলে একটি সূতো ছিঁড়ে দিলেন।

ঋদ্ধিমানের বেড়ে ওঠা

বড় ছেলের বয়স যখন ৯ প্লাস, সেই সময় ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। খেলা ছাড়া আর কোনও কিছুতেই ও আনন্দ পেত না। পরিচিত জগৎ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইত না। মুখের মধ্যে একটা বিরক্তির ছাপ। এলোমেলো চুল আঁচড়ে দিতে চাইলেও বিরক্ত হতো এবং ওর অনিচ্ছায় ওকে দিয়ে কোনও কাজ করানো যেত না। আগে ওকে পড়িয়ে খুব আনন্দ পেতাম। খুব সহজেই ধরে ফেলত আমি কি বলতে চাইছি। কিন্তু সেই সময় পড়াটা যেন ওর মাথায় ঢুকতো না। হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সব সময় অন্যমনস্ক মনে হত। পেছন থেকে গাড়ির হর্ন শুনে সরে যেত না। পেছন থেকে ডাকলে সাড়া দিত না। আমরা প্রথমে E.N.T. Specialist দেখিয়ে ছিলাম। নানান পরীক্ষার পর ওঁরা জানালেন যে ওর কানের কোনও সমস্যা নেই। সমস্যাটা সাইকোলজিক্যাল বা নিউরোলজিক্যাল। প্রথমে আমরা একজন প্রখ্যাত নিউরোলজিস্টের কাছে ওকে নিয়ে যাই। উনি বললেন, ''ক্লিনিক্যালি আমি ওর কোনও ত্রুটি দেখছি না। আপনারা বলছেন বলে

আমি ওর ব্রেনের একটা সিটি স্ক্যান করার কথা লিখে দিচ্ছি।" ওকহার্ট থেকে রিপোর্ট আনার সময়হ রেডিওলজিস্ট বলছিলেন— ''It's very alarming, white matter degeneration, immediate ভাল Neurologist এর সাথে যোগাযোগ করুন।" ডাক্তারবাবু আবার একটা MRI করিয়ে যে রায় দিলেন তা আগেই বলেছি। কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিলাম, ''পৃথিবীর কোথাও কি এর কোনও Treatment নেই?" উনি বলেছিলেন, ''থাকলে তো আমরা জানতেই পারতাম।" তবে উনি ব্যাঙ্গালোরের NIMHANS-এর ডাক্তার পি. সতীশচন্দ্র-র নাম, FAX No. দিয়ে যোগাযোগ করতে বললেন। আমাদের জীবনের সব স্বপ্ন, সব ইচ্ছেগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে লাগলো। ওই ছোট্ট ছেলেটার দৃষ্টি চলে যাবে, চলাফেরা করতে পারবে না, কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে; তারপর সবশেষে Brain death হয়ে গেলে বুঝতে হবে আমাদের গত জন্মের পাপ খণ্ডন হল। কী যে অস্থিরতা দেখা দিল আমাদের মনে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হতো, সব সময় ছেলেটাকে কাছে রাখি। সময় বড় কম, এক মুহূর্ত তাকে চোখের আড়ালে রাখতে মন চাইত না। আমাদের ছোট ছেলেটি যেন এই সময় হঠাৎ করে বড় হয়ে গেল। ও সব সময় দাদার হাত ধরে ধরে এ ঘরে, ও ঘরে, বাথরুমে নিয়ে যেত, দাদাকে সব রকম সাহায্য করতে চাইত। সেই থেকে ওর (ছোটছেলের) নিজের সব চাহিদাগুলো যেন উবে গেল।

> বড় ছেলের বয়স যখন ৯ প্লাস, সেই সময় ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। খেলা ছাড়া আর কোনও কিছুতেই ও আনন্দ পেত না। পরিচিত জগৎ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইত না। মুখের মধ্যে একটা বিরক্তির ছাপ। এলোমেলো চুল আঁচড়ে দিতে চাইলেও বিরক্ত হতো এবং ওর অনিচ্ছায় ওকে দিয়ে কোনও কাজ করানো যেত না।

অস্থির চিত্তে রাত জেগে জেগে ইংল্যান্ড, আমেরিকায় কোথায় আমাদের পরিচিত জনেরা আছেন, খোঁজ নিয়ে নিয়ে চিঠি লিখতে লাগলাম। সালটা ১৯৯৮। আমাদের দেশে তখন FAX চালু হলেও Internet চালু হয়নি। আমরা ইতিমধ্যে পি. সতীশচন্দ্র-র সাথে যোগাযোগ করেছি। উনি কলকাতায় এসে একটা গেস্ট হাউসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন, আমাদের ছেলেকে নানাভাবে পরীক্ষা করার পর ব্যাঙ্গালোরে (এখন বেঙ্গালুরু) NIMHANS-এ নিয়ে যেতে বললেন। এই একজন ভগবানের মতো মানুষ। কী আন্তরিক চেষ্টা মানুষকে ভাল করে তোলার। মানুষের সাথে কী সহানুভূতি নিয়ে কথা বলেন এবং আশা দেন। একাধারে জ্ঞানী ও মানবদরদী। আর ঐ 'নিমহ্যানস'-এ গিয়েই দেখলাম গরীব লোকদের কী সুন্দর চিকিৎসা হচ্ছে, অপারেশন হচ্ছে কত কম খরচে। এখানেই দেখা হয়েছিল বিহার-এর দ্বারভাঙ্গা থেকে আসা আমারই মতো এক হতভাগ্য মায়ের—যার ছেলে রাহুলের একই রকম রোগলক্ষণ—কিন্তু ওর রোগটার নাম মাইটোকন্ড্রিয়াল মায়োপ্যাথি। ফুটফুটে ছেলেটি ক্লাসে ফার্স্ট হত। তখন ও হাঁটতে পারতো না, ওর কথা ভাল বোঝা যেত না। আমার ছেলেদের সাথে খেলা করে (লুডো, দাবা) ওর মনে হয় ক'টা দিন ভাল কেটেছিল। বছর আটেক আগে ও মারা গেছে, খবর পেয়েছি।

আমেরিকায় চিকিৎসা

আমরা ইতিমধ্যে ডাঃ সতীশচন্দ্রের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, U.S.A.-তে জন হপকিন্স হাসপাতালে এই ধরনের রোগ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। পরে ওদেরই একজন নিউরোলজিস্ট Dr. Hugo W Moser বাল্টিমোর Kennedy Krieger Institute -এ (K.K.I) ALD নিয়ে গবেষণা করছেন। ওঁর সঙ্গে আছেন Dr. Raymond এবং আরও কিছু ডাক্তার। একজন দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা ডাক্তার Dr. Sakkubai Naidu-ও ওঁদের সঙ্গে গবেষণা করতেন। ওদের কাছে বহুবার অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে Blood পাঠানো হল। কিন্তু ওরা কনফার্ম করতে পারলেন না ALD কি না। বললেন Skin biopsy করে নিশ্চিত হওয়া যায়। আবার নানা জায়গায় ছোটাছুটি করে skin specialist কে দিয়ে skin পাঠানো হল, কিন্তু তা contaminate করে গেল। এছাড়া KKI-এর ইনস্ট্রাকশন মতো এদেশে বহু পরীক্ষা করা হল। ছেলেটার গায়ে কত যে সূঁচ বিঁধলো, কত যে injection (অনেক ইঞ্জেকশন বেশ কষ্টকর) মুখ বুজে সহ্য করলো, তার ইয়ত্তা নেই। আর কত যে ভাল ভাল লোক আমাদের সাহায্য করলেন, তারও ইয়ত্তা নেই। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছিলাম ওকে সব Fatless খাবার দিতে হবে। কারণ Brain-এ জমা কোলেস্টেরলই ডিমায়েলিনেশন ঘটায়। শুরু হল নানারকম Fatless খাদ্যের সন্ধান। এবার (১৯৯৯) USA-র KKI থেকে ডাক এল। ওরা জানিয়েছিলেন যে আমাদের চারজনকেই ওদের প্রয়োজন।

নানাজনের নানা উপদেশ মাথায় রেখে পৌঁছলাম সেখানে। পৌঁছেই অবাক হয়ে গেলাম প্রত্যেকের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব দেখে। রাস্তায় দাঁড়ালেই 'May I help you' বলে গাড়ি থেমে যায়। কোনও মল-এ বা দোকানে ঢুকতে গেলে আমার আগের লোক দরজাটা আমার জন্য খুলে ধরে থাকেন। KKI-এ পৌঁছনো মাত্র একজন বয়স্ক নার্স (Polly Green) আমাদের receive করলেন। বয়স্ক হলেও তাঁর কথাবার্তাগুলো ছিল বাচ্চাদের মতো সুন্দর। আমার ছোট ছেলেকে রং পেন্সিল, ছবির বই আর লজেন্স দিলেন। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন Dr. Moser-এর কাছে। এই আরেকজন ডাক্তার, যাকে দেখে কেন জানি না আমার যিশুখ্রিষ্টের কথাই মনে হয়েছিল। ভগবানতুল্য মানুষ এরা। আমার স্বামীকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এতেই তো মনের ক্ষত অনেকটাই সেরে যায়। প্রথম দিন ওঁরা আমাদের জন্য বুকিং করে রাখা Ronald Mcdonald-দের একটা নির্দিষ্ট গেস্টহাউসে পাঠিয়ে ছিলেন। দূর দূর থেকে যাঁরা রোগীদের নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসেন এখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। প্রতিদিন দশ ডলার হিসাবে (ওদের কাছে দশটাকার মতো সস্তা) লাগত। ইউরোপ, স্পেন, কানাডা, আরব থেকে আসা রোগীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

পরের দিন থেকে KKI-এ যাওয়া শুরু হল। আমাদের চারজনের ব্লাড, স্কিন টেস্ট হল। কিন্তু আমরা যে আশায় সেখানে গিয়েছিলাম সে সবই বিফল হল। প্রথমত, ওঁরা কনফার্ম করলেন যে ঋদ্ধিমানের রোগটি ALD এবং এই স্টেজে ওর Bone-marrow transplant করলে তা সফল হবে না। তবে ওঁরা আমাদের ছোট ছেলের ব্যাপারে নিশ্চিত করলেন যে ওর ALD হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

এত বড় বড় ডাক্তারদের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্যও আমাদের কাছে হতাশায় (বড় ছেলের জন্য) ম্লান হয়ে গিয়েছিল। Dr. Sakkubai Naidu আমাদের হতাশা কাটাবার জন্যে তাঁর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ করে, নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ালেন যা আমরা এদেশে ভাবতেই পারি না। তিনি নিজে আমাদের গাড়ী চালিয়ে (ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা KKI থেকে) নিয়ে গেলেন এবং বাড়ি পৌঁছে দিলেন। রান্না করতে করতে উনি ভারতে কোনও একজন ডাক্তার বন্ধুকে তার রোগীর অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। মানুষটি যে কী অসাধারণ তা তাঁর কাজকর্ম দেখেই বোঝা গেল।

ঋদ্ধিমানের দিনলিপি

আমেরিকা থেকে ফেরার পর আমরা ভাবছিলাম ওকে 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে কিছুটা পড়াশুনা শেখানো যায় কি না। যদিও ডাক্তারদের কথা শুনে মনে হয়েছিল, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, তবুও আমরা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এটা শিখলে তুমি তোমার প্রিয় গল্পের বইগুলো নিজেই পড়তে পারবে, দেশ-বিদেশের কত ঘটনা তুমি নিজেই পড়তে পারবে। হেলেন কেলারের গল্প বললাম। কিন্তু তখন ওর বিরক্তি এবং হতাশা চরম সীমায়। মাঝেমাঝেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলতো। বলতো — ''আমি চাই না কিছু করতে। আমি যখন ভাল হব তখন পড়াশুনা করব।'' তখন বয়ঃসন্ধির সময় ওর মনে মান-অভিমান, জেদ সবই বেশি। কোনও কথা মনঃপূত না হলে জেদ করে সারাদিন খাওয়া বন্ধ করে দিত। তাছাড়া তখন ওর spasticity এসে যাচ্ছিল; নিজে হাতে খেতে পারছিল না। তাই আমরা আর ওকে ব্রেইল পদ্ধতি নিয়ে জোর করলাম না। কখনও মনে হতো ওর জন্যে যদি একজন উপযুক্ত টিচার পেতাম—যিনি ওকে আনন্দের মধ্য দিয়ে কিছু শেখাতে পারবেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সে সব চেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসু হয়নি। তা ছাড়া, ওই বয়ঃসন্ধিক্ষণে ও বাইরের কাউকে accept করতে পারছিল না। তাই আমি আমার মতো করে ওকে সাহায্য করতে লাগলাম। সকালে ওকে জলখাবার খাওয়াতে খাওয়াতে খবরের কাগজের প্রায় সব খবর ওকে পড়ে শোনানো ছিল আমার একটা আনন্দের কাজ। ও তখন মন দিয়ে সব শুনতো। ওর সঙ্গে কথা বলে সবাই খুব অবাক হয়ে যেত। ক্রিকেটারদের সব স্কোর ওর মুখস্থ। ওর কাকা ওকে কিছু অঙ্ক অভ্যাস করতে বলেছিল যেটা ও করতে খুব ভালবাসতো এবং সময়ও কাটতো ভাল। যেমন— 100, 99, 98, 97 বা 100, 97, 94, 91 বা 1-3, 2-5, 3-7 বা 1-99, 2-98, 3-97 ইত্যাদি।

ঋদ্ধিমান রহস্য রোমাঞ্চ গল্প, মজাদার গল্প, জোক্ শুনতে খুব ভালবাসে। ওর স্টকে এত মজাদার গল্প থাকতো যে আসর জমে যেত। টেনিদার গল্পের ডায়ালগগুলো ও রোজই ব্যবহার করতো নিজের কথাবার্তায়। আনন্দ হলেই বলতো—ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস, ইয়াক, ইয়াক। আর বলতো পান্ডব গোয়েন্দার বাবলুর ডায়ালগ— 'কত গমে কত আটা বুঝিয়ে দেব'। বা 'আপনা গাঁওমে কুত্তা শের'। গল্প শুনতে শুনতে এমন হল—যে গল্পই পড়ে শোনাতে চাই ও বলে— ''এই গল্পটা তুমি আগে শুনিয়েছো।'' আমি মাঝেমাঝে ওর কাছেই সেগুলো শুনতে চাইতাম। মিলিয়ে দেখতাম ঠিকই বলছে। আর ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পান্ডব গোয়েন্দা বারবার শুনেশুনে প্রায় মুখস্থই হয়ে গেল। ও বলতো —''মা এই খণ্ডটা পড়ে শোনাও— দীপাবলি শেষ হলে চারদিকে এখনও আলোর রোশনাই। আমি জিজ্ঞেস করতাম, ''কোন্ খণ্ড বল?'' ও মিটিমিটি হেসে বলতো, ''২০ খণ্ড।'' যে দিন পান্ডব গোয়েন্দার নতুন কোনও খণ্ড বেরতো সে দিনটা ওর আনন্দের কথা ভেবে সবারই মনে আনন্দ হোত।

দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই ও বন্ধুদের নিয়ে মজাদার ছড়া বানাত। সেই অভ্যাসে মাঝেমাঝেই ওর কবিতা এসে যেত। হয়ত রাতদুপুরে বা ভোরবেলায় আমাকে ঠেলা দিয়ে বলতো—''মা, একটা কবিতা লেখো তো।''

— বাড়ি তার বেহালা, নাম তাঁর সৌরভ,

দেশকে দেয় সে বিজয়ের গৌরব। ... ইত্যাদি। এরপর আমি ওকে গল্প লেখার নেশা ধরালাম। ওর প্রিয় দাদু সেইসব গল্প কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে শুকতারায় পাঠাতেন আর ছাপা হলে হাততালি দিয়ে আনন্দ করতেন।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ওরই উৎসাহে বাড়ির ছাদে পাড়ার ছেলেদের ডেকে এনে ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যবস্থা হোত। ও ছাদে এক জায়গায় ব'সে 'ভো-কাট্টা' চিৎকার শুনে শুনে গুনতো, ক'টা ঘুড়ি কাটা হল। হিসেব রাখতো, আমাদের ক'টা ঘুড়ি কাটা গেল এবং অপর পক্ষের ক'টা।

দুর্গাপুজোর জন্যে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে। হুইলচেয়ারে করে ওকে পাড়ার পুজোমণ্ডপে চারদিনই নিয়ে যাওয়া হয়। ও চুপ করে বসে ঢাকের বাজনা শোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আগে ওকে দিয়ে কিছু ব্যায়াম করানোর (ডাক্তারদের ইনস্ট্রাকশন মতো) চেষ্টা করতাম। কিন্তু ক্রমশঃ spasticity বেড়ে যাওয়ার জন্য আমি আর পারি না। একজন ফিজিওথেরাপিস্ট রোজ এসে ওকে ফিজিওথেরাপি ও মালিশ করিয়ে যান। ওকে নিয়ে মাঝেমাঝে আমরা গাড়ি করে ধারে কাছে বেড়াতে যাই। গত বছর সাহস করে ট্রেনে করে জলপাইগুড়ি (ওর ইচ্ছেয়) ঘুরে এলাম। যদিও বেড়াতে গিয়ে এখন আর ওর কোনও আনন্দ হয় না, কিন্তু বৈচিত্র্য তো আসে। আর দেখলাম, সাহস করে একবার বাইরে বেরিয়ে পড়লে কিছু লোক সব সময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ওর হুইল চেয়ারটা বিশেষ ভাবে অর্ডার দিয়ে বানানো। বাইরে গেলে ওটা পটির কাজও করে। পা-টা ছোট জায়গায় নিজের ইচ্ছেমতো রাখতে পারে না বলে ছড়ানো পাদানি যুক্ত করা যায়। তাছাড়া, বাড়িতে ব্যবহারের জন্যে একটা চাকাওলা, হাতলযুক্ত চেয়ার বানানো হয়েছে যা ওর নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কিছু জামাকাপড় বা বিছানাপত্র ওর সুবিধামতো তৈরি করা হয়েছে।

আগে ওর রান্নাটা একটু ভেবে (Fatless হতে হবে) করতাম। সব্জি দিয়ে ডাল সিদ্ধ বা সব্জি দিয়ে খিচুড়ি, চিকেন স্যুপ বা সামান্য তেলে চিলি চিকেন দোসা, চাউ ইত্যাদি বানিয়ে দিতাম। এখন অবশ্য ও বলে দেয়, কী

খাবে। ওর menu তে কোনও রুচিকর খাবার থাকে না। মন থেকে ও এখন সন্ন্যাসী। কোনও ভাল খাবার খাবে না, নতুন জামাকাপড় পড়বে না।

এখন যে ভাবে দিন কাটছে

ভারতে থাকতেই Mr. Augusto Odone নামে The Myeline Project (TMP)-এর একজন কর্ণধারের সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছিল। তাঁর ছেলের (Lorengo) এই রোগটি হয়েছিল। ছেলেটির ওপর একটি ফিল্ম তৈরি হয়েছিল যা দেখলে মনে হয় ফিল্মটা আমাদের ছেলেকে নিয়েই বুঝি তৈরি হয়েছিল। Mr এবং Mrs Odone গবেষণা করে ও অন্যান্য ডাক্তারদের সহযোগিতায় Lorengo Oil নামে একটি Oil তৈরি করেছিলেন যেটি খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শরীরের saturated VLCFA কমে যায়। পরবর্তীকালে জানা গেল Lorenzo Oil দেহের বিভিন্ন অংশে কাজ করলেও মস্তিষ্কে কাজ করছে না। অর্থাৎ ব্রেনে demyelination হচ্ছেই। Dr. Indrajit Singh (Medical University of South Carolina) Lovastatin (যা কোলেস্টেরল কমানোর জন্য ওষুধে ব্যবহৃত হয়) প্রয়োগ করে দেখেছেন সেটি disease progress টা কিছুটা কমিয়ে দিচ্ছে। তাই Dr. Moser, Dr Raymond আমাদের Rovacor 40 (ভারতীয় নাম) প্রেসক্রাইব করলেন। ওখানকার লোকজন বললেন It's hopeful, কিন্তু আমাদের মনে কোনও আশাই জাগেনি। কারণ Disease progressটা কমিয়ে দেওয়ার অর্থতো অসুস্থ অবস্থার দীর্ঘতা বাড়িয়ে দেওয়া। বেশি সময় ধরে কষ্ট পাওয়া। রোগটাকে থামিয়েও দেওয়া যাচ্ছে না, সারানো তো অসম্ভব। তাই নিজেদের আজ বড়ই অসহায় লাগে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে যখন নিউরোলজিস্টদের বাড়িতে ডাকি (কারণ ঋদ্ধিমান এখন পুরোপুরি শয্যাশায়ী) ওরা বলেন লোকাল কোনও ডাক্তার দেখিয়ে Symptomatic treatment করতে। মাঝেমাঝে যখন convulsion হয় তখন কী করবো ভেবে পাই না। এদের প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট কমে যাওয়ায় ইউরিন ইনফেকশন, চোখে ইনফেকশন, নার্ভ পেন বা জ্বর হয় মাঝে মাঝেই। সবসময় লোকাল ডাক্তারদের ওষুধে কাজ হয় না। ওঁরাও নিউরোলজিস্ট consult করতে বলেন। নিউরোলজিস্টরা আবার বলেন, আমরা এই ধরনের রোগী এত কম পাই যে আমাদেরও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা খুব কম। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে নিউরোলজিস্টরাই এদের ভাল বোঝেন। হয়তো এই শহরেই আছেন এমন কিছু ডাক্তার যাঁরা এদের নিয়ে ভাবছেন; যাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে না। এই মুহূর্তে এমন কোনও ডাক্তার যদি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান বা প্রয়োজনে আমাদের যে কোনও রকম সাজেশন দিয়ে উপকৃত করেন তা হলে তাঁরাই আমাদের কাছে ভগবান।

আমার অভিজ্ঞতা বলে নিউরোলজিস্টরাই এদের ভাল বোঝেন।হয়তো এই শহরেই আছেন এমন কিছু ডাক্তার যাঁরা এদের নিয়ে ভাবছেন; যাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে না। এই মুহূর্তে এমন কোনও ডাক্তার যদি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান বা প্রয়োজনে আমাদের যে কোনও রকম সাজেশন দিয়ে উপকৃত করেন তা হলে তাঁরাই আমাদের কাছে ভগবান।

লেখক পরিচিতি : ভাস্বতী রায়চৌধুরী (ঋদ্ধিমানের মা)। মোবাইল নম্বর ৯৮৩৬১৯৩২৪৮ E-mail : bhaswatibrc@gmail.com

ADVERTISEMENT

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৫০ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)
অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

স্মরণে

বিজ্ঞানলেখক উপেন্দ্রকিশোর

তিনি আমাদের কাছে টুনটুনির বই আর ছেলেদের রামায়ণের লেখক হয়েই থাকবেন। তাঁর দেড়শো বছর পূর্তির এই সময়ে অনেক ধূপধুনো, ফুলমালা পড়বে তাঁর ওপর, কিন্তু এই 'শিশু সাহিত্যিক' যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য আর জীবজগতের বিবর্তন নিয়েও লিখছেন, সেটা বিশেষ কারও মনে পড়বে না। উপেন্দ্রকিশোরের বিজ্ঞান নিয়ে অপরূপ লেখাগুলো অবহেলার মধ্যে আমাদের মনন, আমাদের সাহিত্য ভাবনার অসম্পূর্ণতাটাই ধরা পড়ে—লিখছেন **সুব্রত পাল**।

'এক ছিল বুড়ো চাষী, তার নাম ছিল বুদ্ধুর বাপ।'

এটা কোনও নাম হল? কে বলেছে হল না, মায়ের নাম যদি হয় মা, আর বাবার নাম যদি বাবা, তবে বুদ্ধুর বাপের নাম যে হবে বুদ্ধুর বাপ, তা কে না জানে? কাজেই এভাবেই যদি একটা গল্পের শুরু হয়ে যায় তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

তা তো নেই-ই। বিশেষ করে যদি সে গল্পের লেখক হন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ভুল হল, লেখক কোথায়, তিনি তো কথক। তিনি তো গল্প লেখেন না, বলেন। আর এমনও নয় যে এসব গল্প তিনি নিজে বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। সেই কবে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার মশুয়া গ্রামে অতি ছোটবেলায় মা-ঠাকুমা কাকিমা-পিসিমার মতো 'স্নেহরূপিণী মহিলা'দের কাছে শুনেছেন কত গল্প, তার পর বড় হয়ে আরও গল্প জোগাড় করে এনে লিখতে লাগলেন, থুড়ি, বলতে লাগলেন শিশু-পত্রিকার পাতায়, নিজের লেখা বইয়ে।

কেমন সে বলার ধরন? তার একটু শুনে নিই ওই 'বুদ্ধুর বাপ' গল্পের পরের অংশ থেকেই—

'বুদ্ধুর বাপের ক্ষেতে ধান পেকেছে, আর দলে-দলে বাবুই এসে সেই ধান খেয়ে ফেলছে। বুদ্ধুর বাপ ঠকঠকি বানিয়ে তাই দিয়ে বাবুই তাড়াতে যায়। কিন্তু ঠকঠকির শব্দ শুনেও বাবুই পালায় না। তখন সে রেগেমেগে বললে, 'বেটারা! এবার যদি ধরতে পারি, তা হলে ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন দেখিয়ে দেব!...'

বাংলা গদ্যের এমন চমৎকার কথ্যরূপ, বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'প্রচলিত ভাষা'-র এমন সোনা-রং, উপেন্দ্রকিশোর আবিষ্কার করে ফেলেছেন ১৯১০ সালে, তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে সার্থক ছোটদের জন্যে লেখা 'টুনটুনির বই'য়ে। সে বইয়ের প্রতি পাতায় প্রতি গল্পের শরীরী-ভাষায় এমন সপ্রতিভ সহজতা। আর সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে উপেন্দ্রকিশোরের অপরূপ সরস কথনভঙ্গি। ১০০ বছর হয়ে গেল, এ ভাষায় মজে আছে বাঙালি, ছোটরা তো বটেই, বড়দেরও, তার অনাবিল মাধুর্যে মশগুল না হয়ে উপায় নেই।

'টুনটুনির বই' নিয়ে এতটা উচ্ছ্বাসের কারণ হল এই বই প্রকাশের বছর চারেক পরে ১৯১৪-য় প্রমথ চৌধুরী মশাইরা 'সবুজ পত্র' প্রকাশ করবেন এবং চলিত গদ্যকে সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে তেড়ে-ফুঁড়ে লাগবেন। রবীন্দ্রনাথ সহ অনেক লেখক পুরোপুরি নেমে আসবেন সাধু-গদ্যের আসন থেকে। তবে কি না, তিনি তো 'শিশুসাহিত্যিক', তাই শিশুতোষ এই গদ্যকারের নামটা উল্লেখিত হবে না পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যের বিদগ্ধ ইতিহাসে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পেতে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের এক পাতাও উপেন্দ্রকিশোর পড়ার দরকার পড়বে না।

সে দরকার পড়ুক আর নাই বা পড়ুক, উপেন্দ্রকিশোর সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন। সে কেবল ভাষার ক্ষেত্রে নয়, তাঁর জীবন ও কীর্তির বিচিত্র পর্যায়গুলোতে তা বার বার প্রমাণিত। 'টুনটুনির বই' তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের শেষ দিকে, মৃত্যুর মাত্র পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত। তাঁর সেরা কীর্তিগুলোর একটা অবশ্য তখনও বাকি। সেটা হল এর বছর তিনেক পরে, ১৯১৩- তে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ। বাংলা শিশু-পত্রিকা আর শিশুসাহিত্যে এমন সুদিন তার আগে, এমনকী পরেও আসেনি। এ সব নিয়ে কথা-বিস্তার এখানে শিবের গীত হয়ে যাবে। আমরা বরং উপেন্দ্রকিশোরের হয়ে ওঠার পর্বগুলোকে লক্ষ করি।

২

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার মশুয়া (এখন বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায়) গ্রামে উপেন্দ্রকিশোরের ছোটবেলা কেটেছে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বনে-মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, পুকুরে মাছ ধরে। লোককথা, পুরাণকথা, গীতিকা, যাত্রার দেশজ সংস্কৃতির গভীরে মশগুল থেকে। নিজে নিজে বেহালা-মৃদঙ্গ শিখে। অন্য দিকে একটা আলাদা মন তৈরি হচ্ছিল জেলাস্কুলের ব্রাহ্ম হেডমাস্টার রতনমণি গুপ্তের সান্নিধ্যে। পাঠ্য বিষয়ে বিজ্ঞান আর অঙ্কের প্রতি টানে। সে মন অন্ধ সংস্কারবিরোধী মন। সে মন

জগৎ-জীবন সম্পর্কে অনিঃশেষ কৌতুহলী মন।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রথমে নাম ছিল কামদারঞ্জন। তাঁর বাবা কালীনাথ রায়ের কাছ থেকে তাঁকে দত্তক নেন জ্ঞাতি-সম্পর্কিত দাদা, অপুত্রক জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী, আর নিজের নামের সাথে মিলিয়ে নতুন নাম দেন 'উপেন্দ্রকিশোর'।

ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী, সুতরাং সেই সূত্রে গ্রামের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা হরিকিশোরের একান্ত স্নেহের শিখাটি হয়েও তাই ছাত্রবয়সেই তাঁর সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এটাই বিস্ফোরণে রূপান্তরিত হল এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় পড়তে এসে। ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে এসে তিনিও ব্রাহ্ম হয়ে গেলেন। এবং নিজের বাবা কালীনাথ রায়ের মৃত্যুর পর অশৌচ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদির ধার দিয়ে গেলেন না। ফলে হরিকিশোর তাঁকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পালক-মায়ের হস্তক্ষেপে সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়নি। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর এর পর হরিকিশোরের মৃত্যুর পরেও হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করেন নি। তাতে প্রচন্ড ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে, কিন্তু পুনরায় হিন্দু আচারসর্বস্বতায় ফিরে যাননি।

কলকাতায় ব্রাহ্ম মেসে থাকাকালীন তাঁর সহবাসী ছিলেন সিটি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক প্রমদাচরণ সেন। শিশুসাহিত্যের জন্যে এই যুবক আক্ষরিক অর্থে শহিদ হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এঁর নাম সোনার অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত ছিল। 'সখা' নামে শিশু-পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। মাইনের বেশির ভাগ 'সখা'-র জন্যে খরচ করে অর্ধাহারে অনাহারে কাটিয়েছেন। ফলস্বরূপ, অচিরেই রোগাক্রান্ত হয়ে সাতাশ বছর বয়সেই জীবনান্ত। এই প্রমদাচরণের সান্নিধ্যেই উপেন্দ্রকিশোরের 'শিশুসাহিত্যিক' নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 'সখা' নামে শিশু-পত্রিকা প্রকাশে প্রমদাচরণের সহযোগী হয়ে তিনিও তাতে লিখতে শুরু করেন।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম লেখাটি ছিল মাছি বিষয়ক একটা নিবন্ধ, নামও 'মাছি'। 'সখা'-র প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৮৮৩-র জানুয়ারি মাসে। ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় সংখ্যায় এটা প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম দিকের লেখায়, বিশেষ করে জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গ নিয়ে লেখাগুলোতে তথ্যের সঙ্গে জুড়ে যেত দেশ-বিদেশের নানান কাহিনি, লোককথা, প্রচলিত বা লোকমুখে শোনা গল্প। পরবর্তীকালে এই গল্প-অংশ আলাদা হয়ে গিয়ে জন্ম দিয়েছে তাঁর 'টুনটুনির বই' সহ অন্যান্য অসাধারণ গল্পগুলো। এই পর্যায়ে লেখা 'শিয়ালের গল্প'-এর মধ্যে টুনটুনির বইয়ের কয়েকটি গল্পের টুকরো টুকরো আভাসও পাওয়া যায়।

'সখা' প্রকাশের আড়াই বছরের মধ্যে প্রমদাচরণের মৃত্যু হয়। পত্রিকাটিকে আরও কিছুদিন চালিয়ে নিয়ে যান শিবনাথ শাস্ত্রী ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। উপেন্দ্রকিশোর ধারাবাহিকভাবে তাতে লিখে গেছেন। এই সমস্ত লেখার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের অনুসন্ধিৎসু মনটিকে শিশুদের মধ্যে চারিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, সকল গন্ডিবদ্ধতা ও সংস্কার থেকে শিশু-মনকে মুক্তির আলোয় বিকশিত করে তুলতে চেয়েছেন। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যেখানে যা কিছু পেয়েছেন-পড়েছেন সমস্তই নানান মজাদার অনুষঙ্গ সহ শিশুমনের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন। ছোটদের জন্যে লেখা এবং ভাবা তাঁর তখন একমাত্র ব্রত। 'সখা' বন্ধ হয়ে যাবার পরে 'সাথী', 'সখা ও সাথী', 'প্রদীপ', 'মুকুল' ইত্যাদি পত্রিকায় ক্রমাগত লিখেছেন। এসব লেখার সিংহভাগ বিজ্ঞানবিষয়ে। কী নিয়ে না লিখেছেন তিনি! আলো, রং, জলকণা, শব্দ, সংকেত, বেলুন, দূরবীন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য, জীবজগতের বিবর্তন, জোয়ার-ভাঁটা, ধূমকেতু, মুদ্রাযন্ত্র, অন্ধদের বইপড়া, বোবা-কালাদের ভাষা ব্যবহার, হাফটোন ছবি, ফটোগ্রাফি, রোগ-জীবাণু, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগীতবিজ্ঞান ইত্যাদি বিচিত্র বিস্তার তাঁর লেখার। প্রায় প্রতিটি রচনাই ছবি সহ ছাপা হত, যার অধিকাংশই উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা। এই সব লেখার উৎস মূলত ইংরেজি পত্র-পত্রিকা ও বই। মনে রাখতে হবে এইসব বিষয়ের অনেকগুলোই তখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অনালোচিত অথবা অনতি-আলোচিত প্রসঙ্গ। উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের ভাল লাগার মত করে গল্পচ্ছলে প্রথম সেসব আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। 'সখা'-র পাতায় কতদিন আগে 'ধূমপান' নামে লেখায় লিখেছিলেন— 'তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি তোমরা তামাক স্পর্শও করিও না, তামাক বিষ।'

এই সব আলোচনায় উপেন্দ্রকিশোরের ভঙ্গিটি কীরকম তা একটু সরজমিনে দেখা যাক। 'ধূমকেতু' নিবন্ধে লিখেছেন তিনি— 'যাত্রায় যেমন সং, আকাশে তেমনি ধূমকেতু। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর সকলেরই এক একটা নিয়মিত কাজ আছে; কিন্তু ধূমকেতুগুলোকে দেখিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে, যে ইহাদের কোনও বাঁধা কাজ নাই। কোথায় যায় কোথায় থাকে তাহার ঠিক নাই, খালি মাঝে মাঝে এক একবার লেজ পরিয়া আসিয়া, দিন কয়েক তামাশা দেখাইয়া যায়।' আবার 'জলকণার গল্প' বলছেন এ ভাবে— 'খোকার জল খাইবার ছোট গেলাসটিতে বিরানব্বই লক্ষ কোটি জলের অণু আছে। তাহারা কি সকলেই একস্থান হইতে আসিয়াছে? ঝি তাহাদিগকে কলসী হইতে আনিয়াছে বটে, রামা চাকর কলসীতে করিয়া তাহাদিগকে পুকুর হইতে আনিয়াছিল বটে, কিন্তু পুকুরে তাহারা কোথা হইতে আসিল? খোকা এই কথা ভাবিতেছে।'

৩

১৮৯৫ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকাশ করতে শুরু করেন 'মুকুল' নামে শিশু পত্রিকা। তাতে উপেন্দ্রকিশোর নিয়মিত নানা লেখার পাশাপাশি 'আকাশের কথা' ও 'সেকালের কথা' নামে দুটি ধারাবাহিক রচনা লিখেছিলেন। 'আকাশের কথা'-র শুরুটা এরকম— 'অন্ধকার রাত্রিতে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে তারাগুলো বড় সুন্দর দেখায়। তখন ছাদে বসিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিতে বেশ লাগে। তারাগুলো কেমন মিট্‌মিট্ করে, দেখিয়াছ? দুএকজন হাসিখুশি লোক আছে, তাহাদের যত হাসি সব চোখ দুটির ভিতরে। তারাগুলিকে দেখিলে আমার ঐরূপ লোকের চোখের কথা মনে হয়। বোধ হয়, যেন আমাকে দেখিয়া তাহাদের বড়ই হাসি পাইয়াছে।' এমন সরস ভঙ্গিতে এগোতে এগোতে ক্রমশ লিখেছেন তিনি— 'যাহা রোজ ঘটিতেছে, তাহাও অতিশয় আশ্চর্য। এই যে আমরা পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে শূন্যে ছুটিয়া চলিয়াছি, বলিতে গেলে এটাই কি একটা কম আশ্চর্যের ব্যাপার? আমাদের পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে বৎসরে একবার সূর্যের চারিদিক বেড়াইয়া আইসে।

সূর্যটা যদি এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত, আর পৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিত, তবে পৃথিবীর পরিশ্রম একটু কম হইত। কিন্তু এ জগতে কাহারও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার হুকুম নাই। সুতরাং সূর্যও পৃথিবীকে লইয়া নিজে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশের একদিক পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।' এই প্রবন্ধে আকাশের গ্রহ, তারা, ছায়াপথ, ধুমকেতু এবং আরও অজস্র প্রসঙ্গ নিয়ে হিন্দুপুরাণ ও মহাকাব্য, গ্রিক পুরাণের গল্পের অনুষঙ্গ সহ আকাশরহস্যের যে মনোরম বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন তা বঙ্গভাষায় আগে আর হয়নি। প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে এই ভাবে—

'জিনিস হইতে আলো আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িলেই, আমরা সেই জিনিস দেখিতে পাই।...এখন কথা হচ্ছে এই যে, একটা জিনিস হইতে আলো বাহির হয়, তারপর খানিক পথ চলিয়া, সেই আলো আমাদের চক্ষে পড়ে; এইরূপ করিতে তাহার সময় লাগে। যত বেশি পথ চলিতে হয়, তত বেশি সময় লাগে।... পৃথিবী যখন জন্মাইয়াছিল, তখন হইতেই তো তাহার আলো চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। উহার জন্মের সময় হইতে যে আলো রওয়ানা হইয়া গিয়াছিল, তাহা না জানি এত দিনে কোথায় গিয়া পৌঁছাইয়াছে। মনে কর, সেখানে বুদ্ধিমান জীব আছে, আর তাহাদের ভয়ঙ্কর এক-একটা দূরবীন আছে— সেই দূরবীন দিয়া যেন পৃথিবীর মানুষকে ঠিক একটা মানুষের মতনই বড় দেখা যায়। সেখানকার পন্ডিতেরা দূরবীন দিয়া কী রকম পৃথিবী দেখিতে পাইতেছে? সেই তাহার জন্মের সময় পৃথিবী যেমন ছিল, তাহারা তাহাই দেখিতেছে। এখানকার এই নদনদী, পাহাড় পর্বত, দেশ গ্রাম, জাহাজ, রেল, এ-সকলের কিছুই তাহারা দেখিতেছে না। তাহারা হয়ত দেখিতেছে, একটা প্রকান্ড ধোঁয়াটে জিনিস, আর সেটা হয়ত ঐ সূর্যের মতন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! উহার চাইতে ঢের কাছে যদি কেহ সেইরূপ ভয়ঙ্কর দূরবীনওয়ালা থাকে, সে হয়ত পৃথিবীকে ইক্‌থিয়োসোরস্, প্লীসিয়োসোরস্ ইত্যাদি জন্তুতে পরিপূর্ণ দেখিবে! সূর্যে যদি তেমন কেহ থাকে, তবে সে হয়ত, তুমি জলখাবার খাইয়া আঁচাইতে যাইবার সময় দেখিবে যে, তুমি এই সবে খাইতে বসিতেছ।'

প্রবন্ধটি সেই সময়ে খুবই সমাদৃত হয়েছিল।

'সেকালের কথা' প্রবন্ধটি পরবর্তীতে বই হয়ে বেরিয়েছিল। তার ভূমিকায় লিখেছিলেন— 'বালক-বালিকাদিগকে প্রাচীন কালের কাহিনী শুনাইবার জন্য এই পুস্তক লেখা; বিজ্ঞানের কথা বলা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ছেলেদিগকে যেরূপ করিয়া জানোয়ারের গল্প শুনাইলে তাহারা আমোদ পায়, সেইরূপ সহজ কথায় সরল ভাবে এই পুস্তকখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং সকল কথাই বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে মাপিয়া বলা সম্ভব হয় নাই, আর তাহার আবশ্যকও বোধহয় নাই।' বইটি জীবজগতের প্রাগৈতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে লেখা। এই বিষয় নিয়ে বাংলায় প্রথম বই। সেই কারণে এবং শিশুদের জন্যে লিখতে গিয়ে কোথাও সরলীকরণ হয়ে থাকতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকে সাবধানী উপেন্দ্রকিশোর হয়ত ভূমিকায় ওই কথাগুলো বলেছেন। 'সহজ কথায় সরল ভাবে' লিখিত হলেও এটি কিন্তু মোটেই ছেলেভোলানো আমুদে গল্পের বই নয়। উপেন্দ্রকিশোর নিষ্ঠার সঙ্গেই বিজ্ঞানের পথ ধরে এগিয়েছেন। লেখার প্রথমে এসেছে প্রাচীন উদ্ভিদ-জীবজন্তুর পাথুরে প্রমাণ অর্থাৎ ফসিলের কথা এবং সেই প্রসঙ্গে পৃথিবীর জন্ম থেকে নানা রূপান্তরের কথাও।

'প্রথমে পৃথিবী আগুনের মত গরম ছিল, পরে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া তাহার বর্তমান অবস্থা পাইয়াছে। এখন যেরূপ জীবজন্তু আর গাছপালা দেখিতেছি, কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে তাহার কিছুই ছিল না। আবার অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী একেবারেই জীবজন্তুর বাসের অনুপযুক্ত ছিল। তারপর সে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়াছে, আর তাহার অবস্থার উপযোগী জীবসকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' কী ভাবে পৃথিবীতে পাহাড়-পাথরের সৃষ্টি হয়, কী ভাবে এক যুগের মাটি-পাথরের ওপর নতুন যুগের মাটি-পাথরের স্তর সঞ্চিত হয়, কী ভাবে এবং কোন ধরনের পাথরের নিচ থেকে পাওয়া যায় বিভিন্ন যুগের জীবের শরীর-ছাপ কিংবা পাথুরে কঙ্কাল, আর কী ভাবেই বা ভূ-তাত্ত্বিক বা প্রাণতত্ত্ববিদরা তা থেকে সময়ের ধারণা করেন, সামান্য চিহ্ন থেকে অনুমানে গড়ে করে তোলেন পুরোপুরি প্রাণীর আস্ত শরীর। নানান তথ্য, তত্ত্ব, ঘটনা আর চমৎকার উপমার সমাহারে উপেন্দ্রকিশোরীয় ধাঁচে সেসব আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে, প্রাচীনতম উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং সবশেষে স্তন্যপায়ীর বিকাশের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে ডায়নোসর যুগের বিস্তার সবচেয়ে বেশি। উপেন্দ্রকিশোর ডায়নোসরের বাংলা অর্থ করেছেন 'ভয়ানক কুমির'। এমনকী বিভিন্ন ধরনের ডায়নোসরগুলোরও মানে লিখে দিয়েছেন পাশে পাশে। যেমন ব্রন্টোসোরস বাংলায় হয়েছে বজ্র-কুম্ভীর, ট্রাইসিরেটপস্ হয়েছে ত্রিশৃঙ্গানন, স্টেগোসোরস হয়েছে চালকুমির, টেরোড্যাক্টাইল অঙ্গুলিপক্ষ। এ ভাবেই আদিম পাখি আর্কিঅপ্টেরিক্সের মানে করেছেন পুরাতন পাখি, ইকথিয়র্নিসের মানে মাছ-পাখি কিংবা হস্তী জাতীয় স্তন্যপায়ী ডাইনোথিরিয়ম ভয়ানক জন্তু।

ধারণা করা যায়, উপেন্দ্রকিশোরের লেখার গুণে 'সেকালের কথা' সে যুগে ছোট-বড় সকলের কাছেই রূপকথার থেকেও অত্যাশ্চর্য উপাদেয় বস্তু হয়ে উঠেছিল। আরও একটা কথা মনে হয় এই প্রসঙ্গে, সুকুমার রায়ের কিশোর বয়সে 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনাপাঠের গভীর রেখাপাতের ফলশ্রুতিই কি তাঁর কলমে তৈরি 'গোমড়াথেরিয়াম্' বা 'চিল্লানোসরাস্' জাতীয় শব্দাবলি? অথবা বাংলা শব্দের মজাদার মিশ্রণে বানানো 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপ' ইত্যাদির সূক্ষ্ম পশ্চাৎ-প্রণোদনা কি 'ইক্‌থিয়োসোরস্' বা 'প্লীসিয়োসোরস্'-এর বর্ণনা--- 'ইহার (ইক্‌থিয়োসোরস্) মেরুদণ্ডের হাড় মাছের হাড়ের মতন ছিল। মাথা কুমিরের মতন। হাত পা নৌকার দাঁড়ের মতন...।' অথবা... 'এ জন্তুটা (প্লীসিয়োসোরস্) অদ্ভুত ছিল। গোসাপের মুখ, কুমিরের দাঁত, সাপের গলা, তিমির ডানা। কেহ কেহ বলিয়েছেন যে, ইহার চেহারা দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন একটা সাপের গায় একটা কচ্ছপকে গাঁথিয়া দিয়েছে।'

তবে সব কিছুর পরেও 'সেকালেরও কথা'-র সবচেয়ে গুরুত্ব, মনে হয়, লেখক এখানে মহাপৃথিবী এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের তুচ্ছতা সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করতে চেয়েছেন। আজ যে পৃথিবীটাকে মানুষ কেবলমাত্র তারই প্রয়োজনে তৈরি বলে ভাবে, নিজেকে এর অধীশ্বর ভেবে ক্ষমতাগর্বে অন্ধ হয়ে ওঠে, সেখানে আরও হাজারও প্রাণীর মতোই সেও যে একটা সাময়িক বুদবুদমাত্র—এই বৈজ্ঞানিক মহাসত্য একবার নয়, অন্তত কয়েকবার উচ্চারণ করেছেন এই প্রবন্ধে— 'পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের অহঙ্কার একটু কমে। দু'দিন আগে আমরা কোথায় ছিলাম, দু'দিন পরে হয়ত বা কোথায় থাকিব! এরপর আবার কোন দিন হয়তো আমাদের চাইতে ঢের বুদ্ধিমান কোনও জন্তু পৃথিবীতে আসিবে।

তাহারা পাথর খুঁড়িয়া আমাদের হাড় বাহির করিয়া তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিবে, তাহা আমাদের পক্ষে সুখ্যাতির বিষয় না হইতেও পারে। প্রাচীনকালের জন্তুরা যেমন তাহাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, সেরূপ সৌভাগ্য আমাদের হইবে কি না, তাহাই বা কে জানে।'

৪

আগেই বলেছি, উপেন্দ্রকিশোরের জীবন জুড়ে ছোটরাই ছিল সর্বক্ষণের ধ্যান-জ্ঞান। তাঁর সমস্ত উদ্যোগ ও ভাবনা আবর্তিত হত ছোটদের কেন্দ্র করে। ব্রাহ্মসমাজের নীতি বিদ্যালয়ে গানের স্কুল খুলে ছোটদের গান শিখিয়েছেন, গান লিখে স্বরলিপি সহ ছাপিয়েছেন 'মুকুল' এবং 'সন্দেশ' পত্রিকায়। বাড়িতে নিজের ছয় ছেলেমেয়ে, আশ্রিত আরও চারজন। সকলকে অবিরত ছবি আঁকা, গান শেখা, নাটক ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি দূরবিন অথবা বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। ছোটদের পত্রিকার জন্যে কেবল লিখছেনই না, সেগুলো সুপাঠ্য করে তুলবার জন্যে ছবি আঁকছেন নিজে হাতে। আবার আঁকলেই তো হবে না, সেগুলো সুন্দর ভাবে ছাপতেও হবে। সেজন্যে মুদ্রণশিল্পের উন্নতি নিয়ে ভেবেছেন। ১৮৮৫ সাল থেকেই তিনি ফটোগ্রাফি, ব্লক তৈরি ও ব্রোমাইড এনলার্জমেন্টের কাজ শুরু করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে তাঁর ছোটদের জন্যে প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশিত হল ব্রাহ্মমিশন প্রেস থেকে, কিন্তু কাঠের ব্লকে ছাপা তাঁর আঁকা ছবিগুলো প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। উপেন্দ্রকিশোর দুঃখিত মনে বিদেশ থেকে বইপত্র ও যন্ত্রপাতি এনে নিজেই গবেষণা শুরু করলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা শোনা যাক উপেন্দ্রকিশোরের প্রপৌত্র সন্দীপ রায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত একটা প্রবন্ধ থেকে— 'উপেন্দ্রকিশোর আবিষ্কৃত দু'টি বিষয়ের কথা এবার বলা যাক। প্রসেস ক্যামেরার মারফত ব্লকের জন্য নেগেটিভ তৈরি হয়। এই ক্যামেরায় লেন্স এবং নেগেটিভ প্লেটের মাঝামাঝি ঠিক কোন জায়গায় ব্যবহার করলে ফল সব থেকে ভাল পাওয়া যায় সে বিষয়ে গাণিতিক সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। এ ছাড়াও ক্যামেরার লেন্সের যে মধ্যচ্ছদা অংশটি, তাকে বিভিন্ন রকমের নকশায় এবং বিভিন্ন আকারে তৈরি করে নিলে সেগুলোর মাধ্যমে মুদ্রণচিত্রের কোন অংশে কতটা কালি প্রয়োজন হবে, সে বিষয়টিরও পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি ডুয়োটোন এবং রেটিন্ট-এই পদ্ধতিগুলোরও আবিষ্কর্তা তিনিই। তাঁর মেধা ও অধ্যবসায়ের কারণেই সে সময় হাফটোন ফটোগ্রাফি এত উন্নত হতে পেরেছিল। ১৯০৪ সালে 'ব্রিটিশ জার্নাল অফ ফটোগ্রাফি' পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে একটা লেখা বেরল। হাফটোন ফটোগ্রাফির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ঘোষিত হল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং তাঁর প্রবর্তিত ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এর নাম।'

'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' নামটি সন্দীপ হয়ত ভুল করে উল্লেখ করেছেন, কারণ উপেন্দ্রকিশোর এই নামে প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১০ সালে। এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অতি বিখ্যাত 'টুনটুনির বই'। তার আগে 'ইউ রায়, বি. এ., আর্টিস্ট' নামে ব্লক তৈরির জন্যে বিজ্ঞাপন দিতেন। সে যা-ই হোক, বিলেতে উপেন্দ্রকিশোরের আবিষ্কৃত মুদ্রণপদ্ধতি স্বীকৃতি পেয়েছে জেনে উল্লসিত রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৮-এ 'ভারতী' পত্রিকায় লেখেন— 'অনেকেই হয়ত জানেন না, হাফটোন লিপি সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর নিজের আবিষ্কৃত বিশেষ সংস্কৃত পদ্ধতি বিলাতের শিল্পী সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছে...। তিনিই বাঙালীর মধ্যে প্রথম নিজ চেষ্টায় হাফটোন শিক্ষা করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহার সংস্কারসাধনে কৃতকার্য হন।'

এর পরেও উপেন্দ্রকিশোর এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। ১৮৯৭ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত এ বিষয়ে তাঁর ন'টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে বিলেতের বিখ্যাত প্রিন্টিং ও প্রসেস শিল্পের জার্নাল 'প্রসেস ইয়ার বুক : পেনরোজ পিক্টোরিয়াল অ্যানুয়াল'-এ। এগুলো তাঁর গবেষণাপত্র। এবং ইংরেজিতে লেখা। তবে হাফটোন ছবি বিষয়ে তাঁর বাংলা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রদীপ' পত্রিকায়। বাবার স্মৃতিচারণায় সুকুমার রায় লিখেছিলেন— 'কলাবিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিজ্ঞানমুখী প্রতিভা তাঁহাকে নানা সুযোগে নানা বিজ্ঞানের চর্চায় নিযুক্ত রাখিত।' শোনা যায় উপেন্দ্রকিশোর রঙিন ফটো তোলার ক্যামেরা এবং উন্নত বাংলা হরফ তৈরির গবেষণাও করেছেন। তাঁর নিজের আবিষ্কৃত হাফটোন ব্লকে ছাপা ছবি সহ 'ছেলেদের রামায়ণ' পরিমার্জিত হয়ে বেরয় ১৯০৭ সালে, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'সিটি বুক সোসাইটি' থেকে।

'টুনটুনির বই'-এর কথায় ফিরে আসি। এই বইয়ের ভাষা উপেন্দ্র কিশোরের দীর্ঘদিনের ভাবনা ও চর্চার ফসল। আগেই বলা হয়েছে 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিয়ালের গল্প'-এ টুনটুনির বই-এর একাধিক গল্পবীজ ছিল। এই গল্পের প্রায় দেড় দশক পরে কয়েক বছর ধরে 'মুকুল'-এ টুনটুনির বই-এর গোটা পাঁচেক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের সময় গল্পগুলো সাধুভাষাতেই লেখা হয়েছিল। এরও প্রায় এক দশক পরে বইটি প্রকাশের সময় গল্পগুলোকে চলিত বাংলায় নতুন করে লিখেছেন। তার মানে 'শিয়ালের গল্প' থেকে টুনটুনির বই-এ পৌঁছাতে বছর পঁচিশেক সময় নিয়েছেন তিনি। ('সন্দেশ'-এ প্রকাশিত 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' সহ অনেক গল্পেই তিনি এই বইয়ের ভাষা ব্যবহার করেছেন)। উপেন্দ্রকিশোরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো সবই প্রায় এর মধ্যবর্তী সময়ে লেখা। তাই সাধু ভাষাই এই সব লেখার মাধ্যম হয়েছে। আরও একটা কথা মনে হয়, গল্পের ক্ষেত্রে চলিত গদ্যে অসাধারণ দক্ষতা তৈরি হলেও, হয়তো প্রবন্ধের ভাষায় সাধু গদ্য ব্যবহারের সংস্কার ছাড়তে পারেননি। তাঁর সাধু গদ্যও স্বভাবত স্বাদু, তবু প্রথম দিকের ভাষা থেকে পরবর্তী পর্যায়ের ভাষা অনেক বেশি চলিতের কাছাকাছি চলে এসেছে। 'সেকালের কথা' থেকে আরও একটু উদ্ধৃত করা যাক— 'মাদাগাস্কার দ্বীপে 'ডোডো' নামক আর এক প্রকার পাখি ছিল। এই পাখি পায়রার জাতীয়। সে উড়িতে জানিত না, অথচ খাইতে খুব ভাল ছিল। কোন কোন সাহেব এই পাখি খাইয়া তাহার অতিশয় সুমিষ্ট বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা খাইতে এত ভাল লাগে, তাহাকে যদি এত সহজে শিকার করা যায়, তবে মানুষের মত রাক্ষস তাহাকে দুদিনে খাইয়া শেষ করিবে, তাহা বিচিত্র কি?' উদ্ধৃত অংশের ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামগুলো পরিবর্তিত করে দিলেই চলিত গদ্যের সঙ্গে এর কোনও পার্থক্যই থাকে না।

১৯১৫ সালে বাহান্ন বছর বয়সে মৃত্যু না হলে উপেন্দ্রকিশোরের হাত থেকেই হয়তো আমরা প্রথম চলিত বাংলায় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ পেতে পারতাম।

লেখক পরিচিতি : সুব্রত পাল, কবি ও প্রাবন্ধিক।

চলচ্চিত্রে ডাক্তার : গণশত্রু

ডাক্তারবাবু মুর্দাবাদ!

অংশুমান ভৌমিক

যত রাজ্যের সিনেমায় ডাক্তার-বদ্যি-হাকিম খুঁজে পেতে তাদের হসপিটালে, চেম্বারে তো বটেই মায় বেডরুমেও ছানবিন করছি অথচ সত্যজিৎ রায়ের দ্বারস্থ হব না এটা বাড়াবাড়ি। তপন সিংহ ডাক্তারবাবুদের যত খাতিরযত্ন করেছেন সত্যজিৎ রায় তা করেননি এটা ঠিক। তা বলে হেলাছেরেদ্দা করছেন এমনটা নয়। শেষ জীবনে অশক্ত সত্যজিৎকে ডাক্তারবাবুদের অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হত। অনেকে বলেন, এই জন্যই একজন ডাক্তারবাবুকে নায়ক করে ছবি করার কথা তাঁর মাথায় এসেছিল। বলাই বাহুল্য, আমরা গণশত্রু-র কথা বলছি। সত্যি বলতে কী আমাদের শর্টলিস্টে গণশত্রু-র নামটা গোড়া থেকেই ছিল, আর সেটাকে এই মেগা সিরিয়ালের একেবারে লেজে এনে খেলাব এমনটাই ভেবেছিলাম। এখন ভাবগতিক যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে মেগা সিরিয়ালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মেনে আমাদের এই দফতর আরও কিছুকাল চালু থাকবে। পাততাড়ি গোটানোর আগে আরও কিছু সিনেমা নিয়ে বাতচিত করা যাবে। ফলে শেষ পাতে অন্য পদ পরিবেশন করাই মনস্থ হল। আমরা গণশত্রু-র কথা আগে বলে নিই।

গণশত্রু ১৯৯০ সালের ছবি। প্রযোজক ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন ওরফে এনএফডিসি। ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় দেখানোর ঢের আগে সিনেমা ওয়ার্ল্ডের মুখ্য কুলীন কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এ ছবি দেখানো হয়েছে। দেশেবিদেশে খুব সাড়া জাগিয়েছিল এমন নয়। চিদানন্দ দাশগুপ্তের মতো ডাকসাইটে সত্যজিৎপারিষদ গণশত্রু-কে পাতে দেবার যোগ্য নয় মনে করতেন। যে পাতে পথের পাঁচালী, জলসাঘর, চারুলতা, গুপী গায়েন বাঘা বায়েন বা প্রতিদ্বন্দ্বী-র মত হিরেজহরত আছে, সেখানে গণশত্রু-র বরাতে খোলামকুচিই জুটবে এমনটাই ধরে নেওয়া হয়। এমনকী যে দেবী-র সঙ্গে গণশত্রু-র কিছু মিলজুল রয়েছে, তাকেও অনেক উঁচু তাকে সাজিয়ে রেখেছেন চলচ্চিত্রবিদমণ্ডলী।

তবু আমরা গণশত্রু-র ওপর আলোকপাত করছি তার কারণ তিনটে। এক, খোদ সত্যজিৎ। দুই, হেনরিক ইবসেন যাঁর নাটক অ্যান এনিমি অফ দ্য পিপল থেকে এই ছবির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সত্যজিৎ, ছবির টাইটেল কার্ডে তার সবিনয় স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে এই নাটককে বাংলায় গড়েপিটে নিয়ে বেশ কয়েকটা নাটক হয়েছে। প্রথমটা করেছিল শম্ভু মিত্র-র বহুরূপী, বছর ষাটেক আগে। নাম ছিল *দশচক্র*। শম্ভু-তৃপ্তি মিত্রের মেয়ে শাঁওলী তাঁর দল পঞ্চম বৈদিক থেকে এ নাটকের আরেকটা বঙ্গীকরণ করেছিলেন *বিতত বিতংস* নাম দিয়ে। সেও কম সে কম ১৭ বছর আগের কথা। বছর আটেক আগে বহরমপুরের ঋত্বিক এই গণশত্রু নাম দিয়েই ইবসেনকে বঙ্গীকরণ করে। প্রয়াত গৌতম রায়চৌধুরীর পরিচালনায় সে নাটক কত জন দেখেছেন সন্দেহ আছে। তবে তাতে ঝাড়খণ্ডের যদুগোড়ায় পরমাণু জ্বালানি উত্তোলন প্রকল্পের বারফাট্টাই করতে গিয়ে কীভাবে সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকার মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ার চেষ্টা ছিল। রুণু চৌধুরীর নির্দেশনায় কলকাতার কুশীলব গণশত্রু নামে আরেকটা নাটক করেছে। সেটা মোটের ওপর সত্যজিতের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছিল। এত ফিরিস্তি দেবার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। অ্যান এনিমি অফ দ্য পিপল বলে নাটকটা যে ভীষণ ভাবেই আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আছে এবং কতক পরশপাথরের মত মূল নাটকটাকে ভিত ধরে রকমারি দৃষ্টিকোণ থেকে একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের লড়াই বাধার সম্ভাবনাকে তলিয়ে দেখেছেন আমাদের পূর্বজ ও সমকালীন নির্দেশকরা, তার একটা আন্দাজ না থাকলে সত্যজিতের গণশত্রু-র কাছে আমরা পৌঁছতে পারব না।

তিন নম্বর কারণ, নরেন্দ্র মোদি। সত্যজিৎ যখন গণশত্রু করেছিলেন তখন হিন্দু মৌলবাদ মাথা চাড়া দেবার উপক্রম করছিল। আজ যখন আমরা গণশত্রু-কে কাটাছেঁড়া করছি তখন উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির এক আগ্রাসী

নেতা এ দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার দৌড়ে আনেকটাই এগিয়ে গেছেন। এই অবস্থায় গণশত্রু-র পুনর্দর্শন ও পুনর্মূল্যায়ন করা আমাদের জরুরি মনে হচ্ছে।

এবার আসলি বাত।

ইবসেনের লেখা বেরোনোর প্রায় একশ বছর বাদে গণশত্রু-র চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সত্যজিৎ। ১৮৮০ এর দশকের নরওয়ে আর ১৯৯০-এর ভারতের যোজনটাক ফারাক। কাজেই ইবসেনকে সরাসরি মাথায় চাপালে গণশত্রু আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যেত। তা না করে সত্যজিৎ একেবারে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে এনে ফেলেছিলেন ইবসেনের কাঠামোকে। কলকাতা নয়, গণশত্রু-র পটভূমি ছিল চণ্ডীপুর নামে একটা শহর। চট করে কলকাতা আসা যায় না, অথচ একেবারে নাগালের বাইরে এমনও নয়। প্রথম দর্শনে তারাপীঠ, বক্রেশ্বরের কথা আমাদের মনে এসেছিল।

স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে চণ্ডীপুরের নামডাক আছে। সেখানকার হাসপাতালে ডাক্তারি করেন চণ্ডীপুরের ভূমিপুত্র অশোক গুপ্ত (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)। প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করেন। দেখতে দেখতে ২৬ বছর হয়ে গেল ডাক্তারি করছেন ডাক্তারবাবু। প্রৌঢ়ের ঘরে স্ত্রী মায়া (রুমা গুহঠাকুরতা) আছেন। আছেন এক অনূঢ়া কন্যা রাণু (মমতাশঙ্কর), রাণু ইস্কুলে পড়ান।

ছিমছাম পরিপাটি সংসার। বৈঠকখানায় অনেকের আনাগোনা। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তারবাবুর ভাই নিশীথ (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়)। তিনি কেউকেটা লোক। চণ্ডীপুর মিউনিসিপ্যালিটির গেল তিন বারের চেয়ারম্যান। হাল আমলে চণ্ডীপুরের উন্নয়নের মুখ। ডাক্তারবাবুর ঘরে রণেন নামে যে সংস্কৃতিকর্মী যুবকের (ভীষ্ম গুহঠাকুরতা) আসা-যাওয়া আছে তার সঙ্গে রাণুর বিয়ে ঠিক হয়েছে। তাকে চেয়ারম্যান সাহেব বাজিয়ে দেখেন, 'কোন দিকে চলো? ডাঁয়ে বা বাঁয়ে?' আমরা চন্ডীপুরের রাজনৈতিক মেরুকরণকে চিনে ফেলি। বৈঠকখানায় আরেক জন যুবকের উপস্থিতি ইদানীং কারো চোখ এড়াচ্ছে না। তিনি জনবার্তা বলে একটা স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক হরিদাস (দীপঙ্কর দে)। কথায় কথায় বোঝা যায় তিনি যত না ডাক্তার গুপ্তের গুণগ্রাহী, আর চেয়ে তাঁর কন্যারত্ন রাণুর পাণিপ্রার্থী বেশি।

স্থিতাবস্থায় কামড় বসায় একটা রিপোর্ট। সম্পাদক মশায়ের উপস্থিতিতে ডাক্তারবাবুর কপালে ভাঁজ পড়ে। আমরা শুনতে পাই :

- আমি চণ্ডীপুরের বিশেষ একটা জায়গার জল কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম অ্যানালিসিসের জন্যে, এটা তার রিপোর্ট।
- কোথাকার জল?
- চণ্ডীপুরের সব থেকে জনবহুল অঞ্চল।
- ভুবনপল্লী?
- ভুবনপল্লী। এবং এই রিপোর্ট বলছে ওখানকার পানীয় জল রোগের বীজাণুতে ভর্তি।

বৈঠকখানা সরগরম। কেন না এই রিপোর্ট ইঙ্গিত করছে জলবাহিত রোগের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে ভুবনপল্লী। অথচ সেখানে একটা পেল্লায় মন্দির আছে। হাজারো পুণ্যার্থীর যাতায়াত সেখানে। মন্দিরকে ঘিরে একটা বিস্ফারিত অর্থনীতি চলে। সম্পাদক বলেন, 'এই চণ্ডীপুরের সবচেয়ে বড়ো অ্যাট্রাকশন হল ওই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। এর দৈনিক আয়ের কথা শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। এর কিছু অংশ এর কর্তাব্যক্তিদের পকেটে যাচ্ছে না এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমি চাই এদের মুখোশ খুলে দিতে।' অর্থাৎ ডাক্তার গুপ্ত এই ব্যাপারটাকে নিয়ে ফলাও করে একটা লেখা পাঠালে উনি উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধ হিসেবে সেটা ছাপাবেন। জনবার্তার মালিকও (মনোজ মিত্র) এ ব্যাপারে সালিশি করে গেলেন।

ডাক্তার গুপ্ত ঠিক করলেন এ লেখা তিনি লিখবেন। রোজকার চিকিৎসা করতে গিয়েই তো ব্যাপারটা তাঁর নজরে আসে। ইদানীং তাঁর চেম্বারে জন্ডিস রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এ ঠিক সাধারণ অবস্থা নয়। তাই তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ে। সেই মর্মেই কলকাতার ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় ওয়াটার স্যাম্পল। পাকা খবর পাওয়া গেছে। আশঙ্কা অমূলক নয়। অতএব তিনি নিজেই সবাইকে জানাবেন যে মহামারীর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে চণ্ডীপুর। কুসংস্কারকে জিইয়ে রাখতে গিয়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা দিনকে দিন বাড়ছে। দু মাসের মাথায় শিবরাত্রি। এবার তো লাখো পুণ্যার্থীর ভিড় আছড়ে পড়বে চণ্ডীপুরে। সর্বনাশের মাথায় বাড়ি পড়বে তখন!

কথাটা রাষ্ট্র হল। টনক নড়ল মন্দির কর্তৃপক্ষের। নড়েচড়ে বসতে হল চেয়ারম্যান সাহেবকে। পদমর্যাদায় তিনি ভার্গব ট্রাস্টের প্রধান। মন্দিরের আইডিয়া চেয়ারম্যান সাহেবের মস্তিষ্কপ্রসূত হলেও এই ভার্গব ট্রাস্টই ত্রিপুরেশ্বর মন্দির চালায়। মন্দির কমিটির পাণ্ডা মিস্টার ভার্গব (রামগোপাল বাজাজ)-কে নিয়ে তিনি কথা বললেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। ডাক্তারবাবুর সাফ কথা, 'ভুবনপল্লীর জল পরীক্ষা করে রোগের বীজাণু পাওয়া গেছে। মন্দিরের জল আর এটা এক জল। সেই বিষাক্ত জলই লোকে চরণামৃত হিসাবে পান করছে।' কোথাও একটা দূষণ হয়েছে। সেটা মেরামত না হলে সমূহ বিপদ! সবাই যা বুঝবার বুঝলেন। ভার্গবের ধারণা, চরণামৃতে কোনও বীজাণু থাকতে পারে না। কারণ এতে খালি জল নেই, গঙ্গার জল আছে, দুধ আছে, বেল পাতা আছে আর আছে তুলসী পাতা। তুড়ি মেরে কথাটাকে উড়িয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। যাবার আগে ভার্গব বলে গেলেন, 'আমার মন্দিরের বদনাম আপনি দেবেন না। দিস ইজ মাই রিকোয়েস্ট।' কথাটা রিকোয়েস্ট হলেও যে ভাবে ও ভঙ্গিতে সেটা বলা হল তাতে অনুরোধের আসরের নাম গন্ধ রইল না।

আসরে নামলেন স্বয়ং চেয়ারম্যান। দাদাকে ধমকের সুরেই বললেন :

- তুমি একটু সামলে চলবে?
- আমি কি সামলে চলি না?
- তোমায় মাথায় একটা নতুন আইডিয়া এল, তুমি দুম করে সেটা কাগজে পাঠিয়ে দিলে!

ডাক্তারবাবুর কানে অতশত ঢুকল না। ভাইয়ের কৃপায় চাকরি পেয়েছেন বলে এভাবে হাজার হাজার মানুষকে মহামারীর মুখে ঠেলে দিয়ে আর ঋণ চোকাতে রাজি নন তিনি। লেখা ছাপাখানায় যাবে এমন সময় খোদ মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান ছুটে এলেন জনবার্তার অফিসে। সম্পাদকের সঙ্গে, মালিকের সঙ্গে তার কথা হল। মালিক বিলক্ষণ জানেন, তাঁর কাছে প্রগতিশীলতা বা সমাজসেবার চাইতে কাগজের ব্যবসায়িক স্বার্থ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চেয়ারম্যানকে তিনি চটালেন না। সম্পাদকও মালিককে চটালেন না। ডাক্তারবাবুর লেখাটা বেরোল না। উল্টে চণ্ডীপুরের মানুষকে

আশ্বস্ত করে ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করে মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত একটা বিজ্ঞপ্তি বেরোল। সব দেখেশুনে তিতিবিরক্ত হয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন জনবার্তার সহ-সম্পাদক বীরেশ (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়)।

কিংকর্তব্যম্?

কাগজে না বেরোক, মানুষকে তো বলতে হবে। সভা ডাকতে হবে। রণেন সহায়। কোনও বড় হল ভাড়া না পেয়ে এক বনেদি বাড়ির চণ্ডীমন্ডপে পাবলিক মিটিং ডাকলেন ডাক্তারবাবু। ভাল ভিড় হল। গোলমাল হলে সামলানোর বন্দোবস্ত হল। অথচ ডাক্তারবাবু বলতে শুরু করার আগেই অনাহূত আগেভাগেই কলকাঠি নেড়ে এসে চেয়ারম্যান সাহেব ফোড়ন কাটলেন :

- তুমি নিজেকে হিন্দু বলে মনে করো?
- হঠাৎ এ প্রশ্ন?
- কারণ আছে। উত্তর দাও।
- এর উত্তর হল, একশ বার আমি নিজেকে হিন্দু বলে মনে করি। এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।
- তুমি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে গেছো? গত দশ বছরে?
- তুমি যে অর্থে বলছো সে অর্থে যাইনি।
- অর্থাৎ তুমি পুজো দাওনি।
- না।
- কেন? তুমি এ সব সংস্কার মানো না?

চাপান-উতোর চলল। আরও চলতে পারত। পাবলিক ডিবেটের চেহারা নিলে কীই বা ক্ষতি ছিল? কিন্তু রাজনীতিকের বাগপটুতার কাছে চিকিৎসকের সদুক্তিকর্ণামৃত হেরে গেল। তারপর কোত্থেকে দু-চারটে বোমা পড়তেই চণ্ডীমণ্ডপের সভা ভন্ডুল হয়ে গেল। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়ল গণশত্রু ডাক্তার অশোক গুপ্তের নামে। বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ হল। স্লোগান উঠল। বিক্ষোভকারীদের ছোঁড়া ঢিলে ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ল সিঁড়ির ল্যান্ডিঙের রঙিন শার্সি। অন্তরীন হয়ে পড়লেন ডাক্তারবাবু। যাঁর বাড়িতে ভাড়া থাকেন তিনি, তিনিই ডাক্তারবাবুকে চণ্ডীপুর ছেড়ে যাবার যুক্তি দিলেন। ডাক্তার অশোক গুপ্তের মেয়ে হবার অপরাধে রাণুর মাস্টারনির চাকরি গেল। তাঁর নিজের হাসপাতাল তাঁকে শো-কজের চিঠি পাঠাল। এবার ভেঙে পড়লেন প্রৌঢ়। কপাল চাপড়ে মেয়েকে বলতে থাকলেন, 'এই হতভাগাটার জন্যে তোদের সর্বনাশ হল রে রাণু!'

আতঙ্কের কালো রাত আর কাটতে চায় না। তবু এক সময় দিন হল। বৈঠকখানায় বসে পুরো গুপ্ত পরিবার। আছেন তাদের সাংস্কৃতিক কর্মী বন্ধু। হঠাৎ বাতাসের গন্ধ বদলে যায়। ভেসে আসে স্লোগান। স্লোগান না, পাল্টা স্লোগান। সেখানে মুর্দাবাদ নয়, জিন্দাবাদ উঠছে অশোক গুপ্তের নামে। সকলের চোখেমুখে বিস্ময়। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হচ্ছে না।

ডাক্তারবাবু তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মী বন্ধুকে জিগ্যেস করেন :

- কী শুনছি?
- এরা সব আপনার কাছে আসছে।
- এরা কারা?
- আমার থিয়েটারের দল। আর চণ্ডীপুরের বহু ইয়াং শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা। কাল রাতে এরা মিটিং করেছে। আজ আসছে আপনার কাছে, আপনাকে জানাতে যে আপনার পেছনে সকলে রয়েছে।
- এ যে অবিশ্বাস্য! অশোক গুপ্ত জিন্দাবাদ!

একটু আগে এসেছিলেন সেই সাংবাদিক। বীরেশ। অবিচারের প্রতিবাদে তিনি জনবার্তা-র চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। কলকাতার কাগজে ফ্রিল্যান্সিং করছেন। পুরো বিষয়টাকে নিয়ে একটার পর একটা প্রতিবেদন বেরোবে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে। ডাক্তারবাবুর সাক্ষাৎকার বেরোবে। জনমত তৈরি হওয়া আটকাবে না। কিন্তু এই জনমত কীভাবে ব্যবসায়ী-রাজনীতিকদের অশুভ আঁতাতকে প্রতিরোধ করবে তার কোনও দিগদর্শিকা গণশত্রু-তে দেননি সত্যজিৎ। ১০০ মিনিটের মধ্যে দায়সারা ভাবে ছবি গুটিয়ে ফেলেছেন। সন্দেহ নেই যে গণশত্রু দেখে সত্যজিৎ রায়কে চেনা যায় না। না জানা থাকলে প্রভাত রায় বলেও ভুল হতে পারে।

বলে রাখা উচিত যে ইবসেনের নাটক এভাবে শেষ হয়নি। ডক্টর টমাস স্টকম্যান একেবারে একা হয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন, 'যে মানুষটা সবচেয়ে একা সেই মানুষটাই সবচেয়ে ক্ষমতাবান।' শম্ভু মিত্রের দশচক্র-এ এই কথাগুলো ছিল, সত্যজিৎ রায়ের গণশত্রু-তে ছিল না। অসীম নৈরাশ্য দিয়ে ছবির সমাপ্তি ঘোষণা করতে তাঁর আপত্তি ছিল। হয়ত ডাক্তারবাবুদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদাকে এতটা খাটো করতে তাঁর মন চায়নি।

গণশত্রু-র পর আরও দুটো ছবি করেছিলেন সত্যজিৎ। তিন নম্বর ছবিটার চিত্রনাট্য লিখেছিলেন কিন্তু অসুস্থতার জন্য আর এগোতে পারেননি। তাঁর প্রয়াণের বছর দুই পর ছবিটা করেছিলেন সন্দীপ রায়। নাম উত্তরণ। তারও নায়ক ছিলেন এক ডাক্তারবাবু—ডাক্তার সেনগুপ্ত। বিষয় ছিল চিকিৎসা ব্যবস্থার বাণিজ্যিকরণ ও সাধারণ রোগীর প্রান্তিকীকরণ। উদারনীতির প্রবর্তনার বছর খানেকের মধ্যেই সত্যজিতের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। বেঁচে থাকলে এ বিষয়ে আরও খতিয়ে ভাবার সুযোগ পেতেন তিনি।

এই লেখার সঙ্গে কোন ছবি যাবে খুঁজতে গিয়ে মালুম হল গণশত্রু-র ফিল্ম বুকলেট বা লবিকার্ড কোনওটাই আমার কালেকশনে নেই। অতএব ইন্টারনেট ভরসা। 'হরি হে দীনবন্ধু' বলে গুগল সার্চ করতে গিয়ে চোখ

কপালে! সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখ মাঝখানে রেখে দু দিক থেকে উদ্যত তর্জনি সাজিয়ে জবরদস্ত একটি পোস্টার ডিজাইন করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। কলকাতার রাস্তায় সেই গণশত্রু-র সেই পাবলিসিটি ক্যাম্পেন দেখার স্মৃতি আমার মত অনেকেরই মনে জাগরুক আছে। কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সশঙ্কিত মুখ সরিয়ে বিনায়ক সেনের দীপ্যমান মুখ বসিয়ে দিলে কেমন হবে কেউ ভেবেছিলাম? ভাবিনি। একজন অন্তত ভেবেছিলেন। ফোটো সফটওয়্যারের কারিকুরিতে তা সম্ভবও হয়েছে। ওই যে বলে না হাজার কথায় যা হয় না একটা ছবি, স্রেফ একটা ছবি সেটা বলে দিতে পারে? সেটাই সম্ভব হয়েছে দেখলাম। বিনায়ক কী করেছিলেন, কী বলেছিলেন তা নিয়ে ইতিপূর্বে এই পত্রিকায় সাতকাহন হয়েছে। তবু উদ্যত ওই দশ তর্জনির জুতসই তর্জমা করার সাধ মিটছে না।

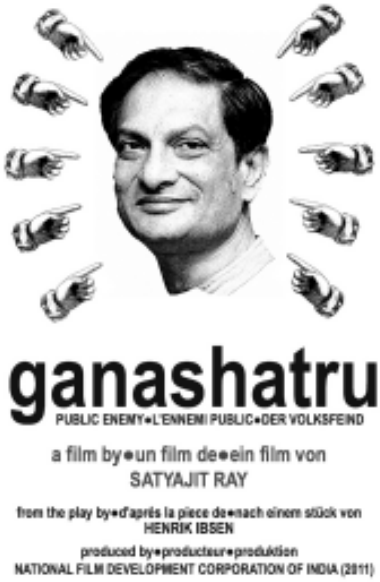

গণশত্রু-র ডাক্তার গুপ্তকে লড়তে হয়েছিল ধর্ম আফিম নেশার বিরুদ্ধে, ধর্মযাজকি পেশার বিরুদ্ধে। এই জাতজালিয়াতদের মাসতুতো ভাই হয়ে ডাক্তার গুপ্তকে একঘরে করতে উঠে পড়ে লেগেছিল এলাকার মাতব্বরেরা, দন্ডমুন্ডের কেষ্টুবিষ্টুরা। পোঁ ধরেছিল কর্তাভজা খবরের কাগজ। সবাই মিলে লোক জুটিয়ে, খেপিয়ে তুলে, হল্লা মচিয়ে অনাসৃষ্টি করেছিল। সত্যি বলতে কী স্টেট মেশিনারি সর্বশক্তি নিয়োগ করে ডাক্তার গুপ্তকে হেনস্থা করতে চায়নি। ছোট শহরের বাইরে এর বড় একটা অভিঘাতও হয়নি। সুতরাং এটাকে আজকালকার জবানে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। কিন্তু ডাক্তার সেনকে লড়তে হয়েছিল রাষ্ট্র ও তার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। অশিক্ষা, অপুষ্টি, অনুন্নয়ন, অসাম্য, অবিচার, মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। তাঁকে শায়েস্তা করতে ময়দানে নেমেছে সালওয়া জুডুম। তাঁকে কোণঠাসা করতে কোমর বেঁধেছে ছত্তিশগড় সরকার। তাঁকে বেকায়দায় ফেলতে প্যাঁচ কষেছে ইউপিএ। তাঁকে পেড়ে ফেলতে চালান করা হয়েছে রায়পুর জেলে। যতদিন পেরেছে তাঁকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে মাস মিডিয়া। যতটা পেরেছে তাঁকে ভুল বুঝেছে আম আদমি। ছন্নছাড়া সিভিল সোসাইটি ছাড়া তাঁর পাশে কেই বা ছিল? এই মুহূর্তে ডাক্তার সেনের সামাজিক অবস্থানকে অভ্রান্তভাবে চিনিয়ে দিয়েছিল গণশত্রু-র নকলনবিশি করা ওই পোস্টার।

কতক ইচ্ছাপূরণের বাধ্যবাধকতায় ডাক্তার অশোক গুপ্তকে সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ। হেনরিক ইবসেনের ডক্টর স্টকম্যানের বেলাতেও তার অন্যথা হয়নি।

দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়। ডাক্তার বিনায়ক সেনের কী হবে? এই উদ্বেগ নিয়ে আপাতত ক্ষান্ত দেওয়া গেল।

লেখক পরিচিতি : অংশুমান ভৌমিক, শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক।

সাধারণ অসুখবিসুখ ও ওষুধবিষুধ সম্বন্ধে জানতে পড়ুন—

ওষুধবিষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিত্যসঙ্গী হাতিয়ার

সংগ্রহ করবার ঠিকানা :
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট
৮৬সি, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন : ২২৬৫-২৩৬৩

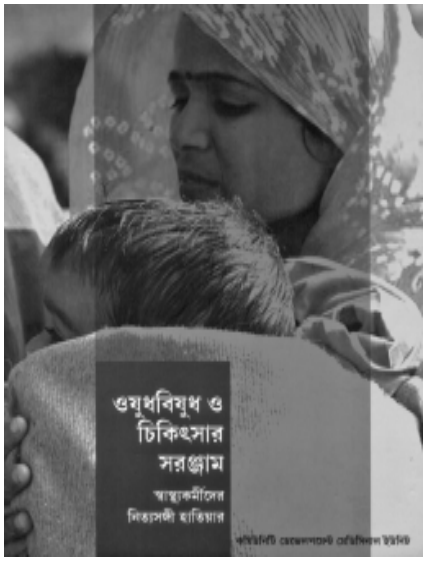

এক নগণ্য জীবাণুর কথকতা

সত্য সাগর

যখন আমার দাদু আমাকে বলেছিল যে মানুষও আমাদের পূর্বসূরিদের থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, আমার মনে হয়েছিল তত্ত্বটার মধ্যে সারবস্তু আছে। আমরা জীবাণুরা হচ্ছি পৃথিবীর আদি জীব এবং মানুষ এসেছে অনেক পরে, তাই অন্তত যুক্তির দিক দিয়ে এটা নিখুঁত।

বুড়ো লোকটা যখন আমাকে বলেছিল, মানুষের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াদের নিরাপদ যাত্রাপথ সুগম করা এবং আমাদের জন্য প্রচুর আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করা—আমি জোর ধাক্কা খেয়েছিলাম, মানুষের মতো জীবের জন্য 'বিবর্তন প্রক্রিয়া'র নিশ্চয় এক মহৎ উদ্দেশ্য আছে— যেমন সুন্দর চলচ্চিত্র নির্মাণ করা, মার্কসীয় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা অথবা আর কিছু না হোক ভাল মদ খাওয়া!

জীবাণুদের পরস্পরের মধ্যেকার আচরণ বুঝতে গেলে মনুষ্যসমাজ এবং তাদের পরস্পরের আচরণ বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবাণু এবং মনুষ্য সমাজের সাদৃশ্য সম্পর্কে আমার এই ধারণা নিয়ে আমার বন্ধুরা খুব হাসাহাসি করে। কিন্তু আমি মনে করি এ বিষয়ে দারুণ এক চিন্তার খোরাক লুকিয়ে আছে।

এ সব ঘটনা অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগের (তোমাদের সময়ের মাপে অবশ্য কয়েক ন্যানো সেকেন্ড) যখন আমি খুব ছোট ছিলাম। এখন আমি অনেক বড় আর অভিজ্ঞ হয়েছি এবং আমি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করি, মানুষ আমাদের যাতায়াতের নিরাপত্তা দেয় এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে। এখন আমি কলকাতায় থাকি এবং আমি নিজের চোখেই দেখছি, দাদু যেমন বলেছিল বিষয়টি ঠিক তেমনই।

ওহ্ কলকাতা! আমি এই শহরকে কত ভালবাসি। এই কলকাতা প্রত্যেক প্রজাতির জন্যে একটি 'বাসা' দেয় এবং প্রত্যেক প্রজাতি তার মতো করে 'বাসাটি' বানিয়ে নেয়। বড় ও ছোট, সরু ও মোটা (সেই ফর্সা গোলগাল, হাতটানা রিকশায় মানুষগুলো), স্তন্যপায়ী ও উভচর, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য—সবার জন্য।

আর কেবলমাত্র জীববৈচিত্রই নয়, লক্ষ্য করো এই বিপুল সংখ্যার দিকে! আমি বলতে চাইছি এই গ্রহের আর একটা জায়গাও নেই, যেখানে আমি মুহূর্তের মধ্যে এক মহানগরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারি। এটা যেন চারিদিকে ছড়ানো এক বিরামহীন চলন্ত রাস্তা। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রাণের সংখ্যা—কুকুর, গবাদি পশু, পাখি, মানুষ মিলে এত বেশি, আমি যেন অবিরাম ভেসে যেতে পারি এবং মাঝে মাঝে মানুষের হাঁচি যেন শব্দের থেকেও দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

এই গ্রহের সেরা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে এটি অন্যতম, তাই আমোদ-প্রমোদের জন্যে এর থেকে ভাল শহর একটা জীবাণু আর পাবে না। না, আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সত্যজিৎ রায়ের সংস্কৃতির কথা বলছি না। এখানে 'সংস্কৃতি'কে ইংরাজি 'কালচার' অর্থে ধরতে হবে। যখন কোনও জীবাণু 'কালচার'-এর কথা বলে, সে বোঝাতে চায় যে মাধ্যমে তারা সর্বাধিক সংখ্যায় জন্মাতে পারে। অন্যভাবে বললে কলকাতা আমাদের শ্বাস নিতে দেয়, খেতে দেয় এবং সব থেকে বড় কথা অপার বংশবৃদ্ধিতে হাত বাড়িয়ে দেয়। মানুষ বোকার মতো একটা তুলনা দেয় 'খরগোশের মতো বংশবৃদ্ধি' করছে। আমাদের কতগুলো গোষ্ঠীর বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা সম্পর্কে এদের কোনও ধারণাই নেই।

মানুষেরা নানা ভাবে আমাদের হাস্যরস সরবরাহ করে — প্রেমে পড়ে বা প্রেমে ধাক্কা খেয়ে, সম্পত্তি নিয়ে মারামারি করে, পড়শিকে হিংসা করে এবং 'চিরযুবা' থাকার চিন্তায় সদা উদ্বিগ্ন থেকে। যদিও কলকাতায় সত্যিকারের সাধারণ মানুষ এখনও আছে, কিন্তু অন্য জায়গার মতো এখানেও তাদের সংখ্যা দ্রুত কমছে। আমি গভীর ভাবে ভেবে দেখেছি, আমাদের জীবাণুদের পরস্পরের মধ্যেকার আচরণ বুঝতে গেলে মনুষ্যসমাজ এবং তাদের পরস্পরের আচরণ বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবাণু এবং মনুষ্য সমাজের সাদৃশ্য সম্পর্কে আমার এই ধারণা নিয়ে আমার বন্ধুরা খুব হাসাহাসি করে। কিন্তু আমি মনে করি এ বিষয়ে দারুণ এক চিন্তার খোরাক লুকিয়ে আছে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক— প্রত্যেক মানুষই আলাদা এবং তারা পুরোপুরি নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে তোলে। এটা কিন্তু একেবারেই ভুল ধারণা কারণ এরা নিজের প্রজাতির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ওপর খুবই নির্ভরশীল। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, যদি তারা পরস্পরের সঙ্গে সব সময় যুদ্ধ করে, তা হলেও তারা একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। আমি যে বিষয়টার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে,'ধনী' হওয়ার কি অর্থ যদি কাউকে ধন দৌলত না-ই দেখাতে পারলে? অথবা 'দেশপ্রেমিক' হওয়ার কি অর্থ যদি তোমার কোনও 'শত্রু'-ই না থাকে?

আরও আমি লক্ষ্য করেছি এই 'ব্যক্তি-মানুষ' গুলোর আচরণ নাটকীয় ভাবে পাল্টে যায় যখন তারা অন্য মানুষদের সঙ্গে থাকে (বিশেষ করে

বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে থাকলে!)। আমার আর একটা বিষয় খুব মনে হয় যে একটা ন্যূনতম সংখ্যার বেশি হয়ে গেলে এই প্রত্যেকটা 'আলাদা ব্যক্তি' যেন সংযুক্ত হয়ে এক দাঙ্গাবাজ জনতা হয়ে যায়। সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক এবং শান্ত শোভন মানুষগুলো একেবারে হত্যাকারী হয়ে ওঠে জনতার অংশবিশেষ হয়ে — ভয়ঙ্কর কিন্তু আকর্ষণীয়।

আমি আকর্ষণীয় বলছি কারণ আমরা জীবাণুরাও মাঝে মাঝে এই রকম নোংরা কাজ করি— যেমন একটা ন্যূনতম সংখ্যায় পৌঁছে গেলে আমরা 'টক্সিন' বা 'বিষ' নিঃসরণ করি। বোধহয় সংখ্যাধিক্যের মধ্যেই সমস্যাটা লুকিয়ে আছে — জনতার ভীড় মানুষ এবং জীবাণু উভয়ের মধ্যের খারাপটা বার করে আনে। জীবাণুরা একত্রিতভাবে অবশ্যই অনেক ভাল কাজও করে এবং একই ভাবে মানুষেরাও এক সঙ্গে অনেক ভাল কাজ করে।

রসায়ন নিয়ে মানুষের সাহসী কাজকর্ম আমাদের বেশ কিছু নতুন মাদকের সংস্পর্শে এনে দিয়েছে। আমাদের মেরে ফেলার জন্যে যে সমস্ত জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয় তার প্রত্যেকটা আমাদের নেশা ধরায়— এরা জানে না এই বস্তুগুলোকে আমরা কত ভালোবাসি।

আমি জানি এখন আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি সেটা শুনলে লোকে আমাকে দাম্ভিক ভাবতে শুরু করবে। কিন্তু তুমি যদি জীবাণু হতে তোমার বিনীত হওয়ার কোনও দরকার হত না। নীচের তথ্যগুলো সে কথাই বলবে।

একটা কাজ কর, তোমরা যত জীব দেখতে পাও যেমন মানুষ, নানারকম জন্তু, গাছপালা ইত্যাদিকে একটা দাঁড়িপাল্লার এক দিকে বসাও, আর এক দিকে যত জীবাণু আছে তাদের বসাও। দেখবে প্রথম পাল্লার ওজন দ্বিতীয়টির মাত্র চার ভাগের একভাগ। অন্য ভাবে বললে জীবাণুরা এই গ্রহের শতকরা আশি ভাগ জৈবভর তৈরি করে। এর একটা বিশাল অংশই সমুদ্রের নীচে কিন্তু তাতে কী-ই বা এসে গেল?

এই গ্রহে এমন কোনও জীব নেই যে আমাদের ছাড়া বাঁচতে পারে। বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, গাছপালাকে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে সকলের জন্য খাদ্য তৈরি করা— সব বিষয়ে আমরা সাহায্য করি। এবং সব কিছু হয়ে গেলে আমরা বর্জ্য পদার্থগুলোকে পুনঃনবীকরণের জন্য নিয়ে যাই। আমরা এগুলো বিনা পারিশ্রমিকে করি ঠিকই— কিন্তু আমাদের যাতায়াতের রাস্তা আর আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ঠিক রাখতে হয়।

আমরা আক্ষরিক অর্থেই 'সর্বত্র' আছি। আমরা ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারি, জমে যাওয়া বরফে বড় হতে পারি, কঠিন পাথরে বা মাটির তিন কিলোমিটার গভীরেও বাঁচি, পরমাণু কেন্দ্রের শীতল করার পাইপেও থাকি, আমরা লবণ কেলাসে লক্ষ লক্ষ বছর টিঁকে থাকতে পারি।

প্রত্যেক মানুষের শরীরে থাকা সহস্র প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা মানুষের নিজস্ব কোষের সংখ্যার দশগুণ। প্রত্যেক মানুষের দেহে তাদেরই ওজন কয়েক কিলোগ্রাম। আমরা প্রত্যেক তন্ত্রকে ঠিক ভাবে চালাতে সাহায্য করি—সে রোগ প্রতিরোধ তন্ত্র থেকে পৌষ্টিক তন্ত্র পর্যন্ত সব কিছু। তবুও এই রাম-শ্যাম-যদুরা বোকার মতো ভাবে, তারা হচ্ছে সব থেকে প্রাথমিক এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যন্ত্র যেটা নাকি জীবনের সর্বোচ্চ রূপ।

আমাকে ভুল বুঝো না। আমি মনুষ্য প্রজাতির বিরোধী নই। সত্যি কথা বলতে কী, তাদের কয়েক জন হচ্ছে আমার প্রিয় বন্ধু। তারা, আমি আগেই বলেছি, আমাদের পক্ষে চারপাশে থাকা জন্তুদের মধ্যে সব থেকে উপকারী জন্তু। এদের নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করার দক্ষতাকে সাবাস জানাতে হয়। আমি ইচ্ছে করলেই একটা প্লেন ধরে নিউ ইয়র্কে আমার দূর সম্পর্কের ভাইবোনের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি (যদিও আমি কলকাতাতেই যথেষ্ট সুখে আছি)। একটা সময় ছিল যখন জীবাণুরা কয়েক কিলোমিটারের বেশি যেতে পারত না আর এখন উড়োজাহাজ ধরে তারা এক সপ্তাহে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে চলে যেতে পারে।

রসায়ন নিয়ে মানুষের সাহসী কাজকর্ম আমাদের বেশ কিছু নতুন মাদকের সংস্পর্শে এনে দিয়েছে। আমাদের মেরে ফেলার জন্যে যে সমস্ত জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয় তার প্রত্যেকটা আমাদের নেশা ধরায়— এরা জানে না এই বস্তুগুলোকে আমরা কত ভালোবাসি।

রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে মানুষের অনধিকার চর্চার তীব্র ইচ্ছা অনেক নতুন নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যেখানে জীবাণুরা খুব দ্রুত বিবর্তিত হয় এবং বংশবৃদ্ধি করে। মানুষ যাকে অ্যান্টিবায়োটিক বলে, যাকে মনে করা হয় মানুষকে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে— তার উদাহরণটা নেওয়া যাক। প্রায় আট দশক আগে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং নামে মানুষটি ঘটনাচক্রে যখন এটা আবিষ্কার করেছিল, সবাই ভাবল এই 'যাদুকর' আমাদের সবাইকে একেবারে দুনিয়া থেকে মুছে দেবে।

এটা সত্যি প্রথম কয়েক বছর আমরা বেশ কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলাম, কিন্তু প্রথম দিকের এই যন্ত্রণা আমাদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। তাই আজ এমন একটাও অ্যান্টিবায়োটিক নেই যাকে আমরা বিনির্মাণ করতে পারি না। যত জটিল অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার হয়, সেটাকে চূর্ণ করতে আমরা তত বেশি মজা পাই।

এই মানুষদের সত্যিকারের সমস্যাটা কোথায়, তোমাদের বলি শোনো। তোমরা তো দেখলে আজ মানুষ যা হয়েছে সে আমাদের সাহায্য নিয়েই

হয়েছে। তবুও তাদের মাথায় এটা ঢুকে গেছে যে তারা হচ্ছে এই গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এবং অন্যরা তাদের পদানত হয়ে থাকবে।

মানুষের এই 'আত্মম্ভরী' চিন্তাটাই হাস্যকর। আমি যতটুকু বুঝেছি এই দুপেয়ে জীবদের 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' যতটা আছে, তাদের প্রকৃত বাস্তবটা ঠিক সেরকম নয়। মাত্র কয়েক জনকেই অন্য উচ্চতায় বসানো যায়, তাও অনেক ঝাড়পোঁছ করে।

আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গ 'অ্যান্টিবায়োটিক'-এ ফেরা যাক, যেটা দিয়ে ব্যাকটেরিয়া নিধন করা হবে বলে ভাবা হয়েছিল। আদতে 'বায়োস' হচ্ছে গ্রিক কথা, যার অর্থ হচ্ছে 'জীবন'। সুতরাং অ্যান্টিবায়োটিকের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'জীবন বিরোধী'। কতটা ঔদ্ধত্য থাকলে 'জীবন বিরোধী' একটা বস্তুকে 'জীবনদায়ী' ভাবার মতো চিন্তা আসে?

মনে প্রশ্ন ওঠে, মানুষের চিকিৎসা বিদ্যার বেশির ভাগ পরিভাষা, যেমন 'ম্যাজিক বুলেট' বা 'যাদু গুলি', 'ইনভেসান' বা 'দখল করা', 'এলিমিনেসান' বা 'বিতাড়ন করা' অথবা 'রেজিস্টেন্স' বা 'প্রতিরোধ' কেন 'যুদ্ধের অভিধান' থেকে নেওয়া হয়েছে? এবং অবশ্যই আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা এর বিনিময়ে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যাকে নতুন কিছু শব্দ সরবরাহ করেছে। যেমন 'টেররিজ্‌ম' বা সন্ত্রাসবাদকে তুলনা করা হচ্ছে 'সংক্রামক' রোগের সঙ্গে, আর 'টেররিস্ট' বা সন্ত্রাসবাদী-কে ভাবা হচ্ছে 'ভাইরাস'। প্রত্যুত্তরে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' বা শল্যচিকিৎসার প্রয়োগ করা হচ্ছে যাতে 'স্টেরাইল জোন' বা সংক্রমণবিহীন এলাকা তৈরি করা যায়। এটা এমন একটা বিষয় যেখানে 'প্রতিরোধ' হচ্ছে সব থেকে যুক্তিযুক্ত পরিণতি এবং এখন সময় হয়েছে 'জীবাণু' এবং 'সন্ত্রাসবাদী' সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদল করার।

মানুষ যেটা বোঝে না, প্রথমত তারা আমাদের নির্মূল করে দিতে পারবে না— কারণ আমরা সংখ্যায় বিপুল। এবং দ্বিতীয়ত যদি তারা আমাদের মুছেও ফেলে তা হলে তারা নিজেদেরও মুছে ফেলবে। বিগত দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ জীবাণুকে কেবলমাত্র রোগের কারণ হিসাবেই ভেবে এসেছে। আমাদের নিজের সুবিধামতো এরা 'ভিলেন' বা দুশমন হিসাবে দাগিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের 'নির্দোষ শিকার' হিসাবে দেখে এসেছে।

আমাদের নির্মূল করার মানুষের সব চেষ্টাকেই প্রতিরোধ করতে পারি। তা হলে মানুষ আমাদের কাছ থেকে কী শিখবে? মানুষ প্রকৃত অর্থে যেহেতু জীবাণু সমুদ্র দ্বারা পরিবৃত, তাই এটা কি এখন শেখার সময় নয় যে শুধু সাঁতার কাট, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না?

এটা কি মানুষের নিজেকে ধ্বংসের কিনারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তার নিজের ভূমিকা মনে করিয়ে দেওয়ার সময় নয়? মানুষ প্রকৃতির অজানা শক্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার যে চেষ্টা সর্বদা চালিয়ে গেছে তারই ফলে তৈরি হয়েছে আজকের নগর সভ্যতা। তার ফলে তারা এক কৃত্রিম নিরাপত্তা পেয়েছে এবং পরিবর্তে রোগ ও অন্যান্য বিপদের সঙ্গে লড়ার প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাকে বিসর্জন দিয়েছে।

তাই যে অ্যান্টিবায়োটিককে একটা 'কুইক ফিক্স' সমাধান ভাবা হয়েছিল সেটাই এখন ভুবনায়িত বিশ্বের পরিবেশকে পরিবর্তিত করার ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে 'স্লো ফিক্স'। এটা আসলে কয়েক হাজার বছরের ভুল পদক্ষেপকে সংশোধন করতে এক অন্তিম, মরিয়া চেষ্টা নয়?

এই সত্যটা মেনে নেওয়া হোক আমরা জীবাণুরা এমনই চালাক যে আমাদের নির্মূল করার মানুষের সব চেষ্টাকেই প্রতিরোধ করতে পারি। তা হলে মানুষ আমাদের কাছ থেকে কী শিখবে? মানুষ প্রকৃত অর্থে যেহেতু জীবাণু সমুদ্র দ্বারা পরিবৃত, তাই এটা কি এখন শেখার সময় নয় যে শুধু সাঁতার কাটো, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না? আমরা কি এমন স্বপ্ন দেখতে পারি না, যেখানে মানুষ জীবাণুর সঙ্গে সহাবস্থান করছে, এবং আমাদের মারার চেষ্টা করে আমাদের হাতে নিজেদের মরণ ডেকে আনছে না?

লেখক পরিচিতি : সত্য সাগর জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী ও প্রাবন্ধিক।

অনুবাদক পরিচিতি : ডা. সুমিত দাস 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক।

কুইজ উত্তর

(১) না। (২) না। (৩) না। (৪) না। (৫) না। (৬) না। (৭) রক্তে সিডি-৪ লিম্ফোসাইটের সংখ্যা প্রতি ঘনমিলিমিটারে ২০০-এর চেয়ে কমে যাওয়া। (৮) শরীরের জীবাণু (ও কিছু ধরনের ক্যানসার) এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কমে যাওয়া। (৯) ক্যান্ডিডা সংক্রমণ—এতে মুখের ভেতরে, গলায়, যোনিতে সাদা আস্তরণের মতো দেখা যায়। (১০) অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি, সংক্ষেপে এ-আর-টি। (১১) না, পুরো সারে না। তবে জীবনকাল বাড়ে ও প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে। (১২) ৭২ ঘন্টা। (১৩) না। সরকারি রেজিস্টারড এ-আর-টি সেন্টারে এ-আর-টি বিনা পয়সায় দেওয়ার কথা। (১৪) কয়েকটি নির্দিষ্ট সরকারি হাসপাতালের এসটিআই / আরটিআই (সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ / রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্ট ডিজিস) বিভাগে এই সুবিধা আছে। (১৫) মেডিকেল কলেজ, এস এস কে এম (পিজি), কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, ও এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল। (১৬) ১ ডিসেম্বর।

কুইজ

এবারের বিষয় এডস। কুইজটি তৈরি করেছেন অভিষেক দাস, পুনে তে একটি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পাঠরত।

প্রশ্ন :

১। দৈনন্দিন সাধারণ সামাজিক বা পারিবারিক মেলামেশার ফলে এড্‌স ছড়াতে পারে?

২। চুম্বনের ফলে এড্‌স ছড়াতে পারে?

৩। কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশনের সময়ে উদ্ধারকারী অন্যের মুখে লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে শ্বাস চালু করে। এর ফলে কি এড্‌স ছড়াতে পারে?

৪। একটা মশা এক এড্‌স রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর পরে আরেক জনকে কামড়ালে দ্বিতীয় ব্যক্তির এড্‌স হবার সম্ভাবনা থাকে?

৫। এড্‌স রোগী, এই কারণে কাউকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা বা সামাজিক বিভিন্ন অধিকার থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে?

৬। এইচ আইভি-আক্রান্ত হওয়া মানেই কি এড্‌স রোগ?

৭। এইচ আইভি জীবাণুর উপস্থিতিতে কোনও রক্তপরীক্ষার ফল দেখেই এড্‌স রোগ হয়েছে বলা যায়?

৮। এড্‌স রোগীর মূল সমস্যা কী?

৯। এইচ আইভি-আক্রান্ত মানুষের শরীরে কোনও ছত্রাক সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়?

১০। এড্‌স রোগের চিকিৎসার সাধারণ নাম কী?

১১। এড্‌স রোগ কি চিকিৎসায় সেরে যায়?

১২। এড্‌স রোগীর সঙ্গে রোগ ছড়ানোর মতো দৈহিক ঘনিষ্ঠতা বা রক্ত, সিরিঞ্জ, কামড় ইত্যাদির মাধ্যমে এড্‌স রোগের সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা তৈরি হলে, সেই ঘটনার কতক্ষণের মধ্যে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধ (এ-আর-টি) দিলে কাজ হতে পারে?

১৩। এ-আর-টি কি খুব দামি ও পাওয়া শক্ত?

১৪। সরকারি হাসপাতালে কোনও বিভাগে গেলে এড্‌স রোগীরা রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত সুযোগ পেতে পারেন?

১৫। কলকাতায় কোনও কোনও সরকারি হাসপাতালে এই সুবিধা আছে?

১৬। ওয়ার্ল্ড এড্‌স ডে (বিশ্ব এড্‌স দিবস) কোন দিন?

উত্তর ৫৯ পাতায়

With Best Compliments from :

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road
Kolkata 700027
Phone : 0332449-0144
Mob : 9830663724
Email : kloster_ pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com